শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

চীনভবন, বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৫৪

মূল্য আড়াই টাকা
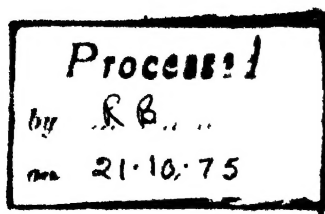
মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

যাঁহারা আমারে কলঙ্ক দেন
যাঁহারা করেন ক্ষতি,
যাঁহারা হানেন বিদ্রূপ-বাণ
সতত আমার প্রতি,
তাঁহাদের তরে জাগে প্রার্থনা
অন্তরে নিরবধি,
তাঁরা যেন পান তথাগত-পদ
তাঁরা যেন পান বোধি।

শত্রু কোথায়। অনিষ্টকারী
কাহারে বলিছ তুমি।
আমি তো দেখেছি মিত্রে পূর্ণ
রয়েছে মর্ত্তভূমি।
ক্রোধ-জয়ী ওই ক্ষমা অনুপমা
যাহা আনি দেয় বোধি,
কেমনে লভিতে ক্রোধের কারণ
অরি না রহিত যদি।
লভিবারে যাহা করি প্রযত্ন
সতত সেবিয়া ধর্মে।
তাই দিল মোরে শত্রু আমার
আঘাত হানিয়া মর্মে।
ধর্মেরই মতো তিনিও পূজ্য
করি বন্দনা তাঁর,
শত্রুর বেশে বন্ধু আমার
খোলে মুক্তির দ্বার।

প্রাচীন ভারতের যে-মৈত্রীর আদর্শ বোধিসত্ত্বের জীবনে পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল,

যাহার কথা এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে উচ্ছলিত হইতেছে, সেই মৈত্রী যিনি এই বিংশ

শতাব্দীতে 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর' হইতে মারণাস্ত্র-পীড়িতা

ধরিত্রীর দিকে দিকে, দেশে দেশে যাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন,

যাঁহার কাব্য, যাঁহার বিশ্বভারতী সেই মৈত্রীর নীড়,

সেই পরমগুরু রবীন্দ্রনাথের মধুময় স্মৃতির উদ্দেশে

শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার

উৎসর্গ করিলাম।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

আচার্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার অপূর্ব গ্রন্থ। সরল সুললিত ভাষায়, মধুর মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বিশ্বজনীন উদার ধর্মের কথা, ইহাতে ছন্দোবদ্ধ মনোমুগ্ধকর কাব্যের রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যাহাতে পৃথিবীর কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের মতভেদ নাই, যাহা সমস্ত ধর্মের ভিত্তি ও প্রাণস্বরূপ, যাঁহারা ধর্ম মানেন না—এমন কি যাঁহারা সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের উচ্ছেদকামী, এমন অনেক মানবসংঘেরও যাহা মূলমন্ত্র, সেই সাম্য ও মৈত্রীই এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু।

প্রথমেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে অশুভ বা অন্যায় অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উহার প্রবল শক্তি। বহু প্রকার শুভপ্রচেষ্টাও অবশ্য পৃথিবীতে রহিয়াছে, কিন্তু ঐ ভয়ংকর অন্যায়কে জয় করিবার শক্তি কাহারো নাই। তাহাকে জয় করিতে পারে কেবলমাত্র এই মৈত্রী।

"সংসারে সকলেই দুঃখ দূর করিতে চায় এবং সকলেই সুখ চায়। কিন্তু কেমনভাবে উহা লাভ হইবে, তাহার যথার্থ পদ্ধতি তাহাদের জানা নাই। সেইজন্য দুঃখ হইতে বাহিরে আসিতে গিয়া, দুঃখের মধ্যেই তাহারা প্রবেশ করিতেছে, সুখের চেষ্টায় মূঢ়তাবশত নিজের সুখকেই শত্রুর ন্যায় ধ্বংস করিতেছে।

"জগতের সর্বদুঃখ দূর করিতে হইলে, জগৎকে সকল সুখে সুখী করিতে হইলে—এই মৈত্রীরই আশ্রয় লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য কোনো পথ নাই।"

উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন: "পরলোক, মোক্ষ বা মুক্তি তো দূরের কথা— ইহা ব্যতীত এই সংসারেই বা সুখ কোথায়। ইহা না থাকিলে সংসারই যে অচল হইয়া যায়।

"এই পৃথিবীতে সুখোৎসব সৃষ্টি করিতে হইলে, ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা দেশ, নানা জাতি বা নানা জন রূপে না দেখিয়া, এক অখণ্ড পৃথিবী বা প্রাণিলোক হিসাবেই দেখিতে হইবে।

"দুঃখকে আমার দুঃখ, তাহার দুঃখ, এ জাতির দুঃখ, এ দেশের দুঃখ, এইভাবে বিচ্ছিন্নরূপে না দেখিয়া, এক অখণ্ড দুঃখরূপে দেখিয়াই তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন এই পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর হইবে না। মোহমুগ্ধ জনগণ নিজ নিজ খণ্ড খণ্ড সুখ আহরণের চেষ্টায়, একে অন্যকে দুঃখ দিয়া প্রত্যেকেই ঘোর দুঃখ আহরণ করিতেছে।

"নানা অবয়বযুক্ত হইলেও আমাদের এই দেহ যেমন এক এবং অভিন্ন। এই জগৎও সেইরূপ এক এবং অভিন্ন। দেশ, জাতি, বা ব্যক্তিবিশেষ তাহার অবয়ব মাত্র।

"করচরণমস্তকাদি নানা অঙ্গভেদে বহুরূপবিশিষ্ট এই দেহকে যেমন আমাদের এক মনে করিয়া পালন করিতে হয়, সমান সুখদুঃখান্বিত জীবজগৎকেও সেইরূপ এক মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। করচরণাদির সুখদুঃখ যেমন আমাদের নিকট ভিন্ন নহে— এক, সমস্ত জগতের সুখদুঃখও সেইরূপ ভিন্ন নহে— এক।

"এইরূপ অখণ্ডিত দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিলে সর্বত্র যাহাতে সমান সুখ হয়, সর্বত্র যাহাতে

সমান পুষ্টি হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য আসিবে। কেবলমাত্র দেহের কোনো এক অঙ্গবিশেষ পুষ্টিলাভ করিলে, যেমন তাহা অনর্থের কারণ বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ পৃথিবীর কোনো দেশ-বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের মাত্র উন্নতি বা পুষ্টি হইলে তাহাকেও অনর্থের কারণ মনে করিয়া সেই পুষ্টি বা সম্পদ সর্বত্র সমানভাবে বণ্টন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

"আমি উন্নতিলাভ করিয়াছি—সুখী হইয়াছি। সম্মানিত ও প্রশংসিত হইতেছি—ভালো কথা; আমার এই সুখসম্পদ, সম্মানপ্রশংসা সর্বত্র ভাগ করিয়া দিতে হইবে। তাহা ভিন্ন আমার এই উন্নতি এক অঙ্গের উন্নতির ন্যায় বিপজ্জনক হইবে।

"অতএব, অনুন্নত হীন জনগণকে "আমি" মনে করিয়া এবং "উন্নত আমাকে" পর মনে করিয়া—কার্য করিয়া যাইব[১]।

" 'ইনি ধনী, উচ্চপদস্থ, আমরা দীন, হীন, নিঃস্ব। ইনি সম্মান পান। আমরা পাই না। ইনি প্রশংসিত হইতেছেন। আমরা নিন্দিত হইতেছি। ইনি সুখী, আমরা দুঃখী। আমরা কর্ম করিতেছি, ইনি নিষ্কর্মা হইয়া সুখে জীবনযাপন করিতেছেন। ইনি নাকি গুণবান। কিন্তু ইহার গুণের দ্বারা আমাদের কী কাজ হইতেছে। ইহার ধন, ইহার সুখসম্পদ আমাদের কাড়িয়া লইতে হইবে। আমাদের দুঃখের ভার ইহার উপর চাপাইয়া দিতে হইবে।'

"এইভাবে আমিই তখন সেই অনুন্নত হীনজনরূপে পরিবর্তিত হইয়া, সেই "উন্নত আমাকে" ঈর্ষা ও হিংসা করিব। যতদিন পর্যন্ত আমা অপেক্ষা হীনজনগণ—আমার সমান না হয়, ততদিন পর্যন্ত নিজেকে সুখ সম্মান ও ধনাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া—তাহাদিগকেই ধনী, সুখী ও সম্মানিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

"এইভাবেই এই সংসারে সুখোৎসব সৃষ্টি হয় এবং সেই সুখোৎসবে সকলেই সমান অংশ গ্রহণ করে—কেহই বঞ্চিত হয় না।"

সম্পূর্ণ স্বার্থবুদ্ধিতেই যদি আমরা চলি, তথাপি ইহা ভিন্ন আমাদের গতি নাই। কেননা :—

একমাত্র আমিই যদি বিদ্বান, সৎ, স্বাস্থ্যবান ও ধনী হই, আর আমার গ্রামের অন্য সমস্ত লোক, অসৎ, মূর্খ, রোগী ও নির্ধন হয়—তবে আমার অবস্থা কী হইবে।

নির্ধনগণ আমার ধন হরণ করিয়া লইবে। চতুর্দিকের নানারোগ ধীরে ধীরে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে। মূর্খের মধ্যে থাকিতে থাকিতে চর্চার অভাবে এবং তাহাদের প্রভাবে আমার বিদ্যা এবং জ্ঞানও ক্রমে লোপ পাইবে। চতুর্দিকের অসৎ চরিত্রের দল আমার পারিবারিক পবিত্রতা রাখিতে দিবে না।

সুতরাং আমারই স্বার্থের জন্য, গ্রামের সকলকে বিদ্বান, সৎ, স্বাস্থ্যবান এবং ধনী করা প্রয়োজন। আমার গ্রামের লোকসমষ্টি যে-পরিমাণ সৎ, বিদ্বান, জ্ঞানী, স্বাস্থ্যবান এবং ধনী হইবে, সেই পরিমাণে আমার বিদ্যা স্বাস্থ্য এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে।

---

১ গ্রন্থকার বলেন—ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। অভ্যাসের দ্বারা ইহা সম্ভব হয়।

এখন আমার গ্রামকে তো সকল বিষয়ে উন্নত করিলাম। কিন্তু আমার গ্রামের চতুর্দিকের অন্য গ্রামগুলির যদি ঐ সমস্ত বস্তু না থাকে, তবে তো সেই পূর্বের সমস্যাই রহিয়া গেল।

অতএব দেখা যাইতেছে, আমারই স্বার্থের খাতিরে জেলাশুদ্ধ সমস্ত লোকের বিদ্যা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদির প্রয়োজন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি হইবে যে, জেলা লইয়াও ঐ সমস্যার সমাধান নাই। এই এক 'আমি'র জন্য জেলা, জেলা হইতে প্রদেশ, প্রদেশ হইতে দেশ এবং দেশ হইতে সমস্ত পৃথিবী পর্যন্ত টানিতে হইবে।

এইরূপে যখন সমস্ত পৃথিবীর উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপর আমার এই 'আমি'র উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে, তখন আমি যাহাকে 'আমি' বলিয়া জানি সেই 'আমি' কার্যত এক অঙ্গ মাত্র। সমস্তের উন্নতি ভিন্ন এক অঙ্গের উন্নতি অসম্ভব।

প্রাচীনকালে এই গ্রন্থ চীন (৯৮০-১০০১ খ্রীঃ) তিব্বতী (৯ম খ্রীঃ) ও মোঙ্গলীয় ভাষায় অনূদিত হয়। আধুনিককালে ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায়[১] ইহার একাধিক তর্জমা বাহির হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা ব্যতীত ভারতীয় আর কোনো ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই। ১৩৪০ সালে পণ্ডিতপ্রবর স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য মহোদয়ই সর্বপ্রথম এক ভারতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। শেরপুরের গুণগ্রাহী জমিদার গোপালদাস চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায় ও অর্থব্যয়ে উহা মুদ্রিত হয়।

আচার্য শান্তিদেব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সৌরাষ্ট্রে (গুজরাটে) জন্মগ্রহণ করেন। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন—শান্তিদেব রাজপুত্র ছিলেন। অভিষেকের পূর্বদিন তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে এবং তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

শিক্ষাসমুচ্চয়, সূত্রসমুচ্চয় ও বোধিচর্যাবতার, এই তিনখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। ইহার মধ্যে সূত্রসমুচ্চয় পাওয়া যায় না।

শিক্ষাসমুচ্চয় একখানি অনুপম গ্রন্থ। শতাধিক মহাযান শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে উহাতে পাঠসংগ্রহ করা হইয়াছে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম যে কেমন করিয়া অর্ধজগতের কোটী কোটী মানবের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল—উহা পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ংগম হইবে। অধ্যাপক সেসিল বেণ্ডাল (Cecil Bendall) ইহা সম্পাদন করিয়া সেন্টপিটর্সবার্গ হইতে ১৮৯৭-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। তিনি ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদও করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবিতকালে উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর অধ্যাপক রুজ্ (W. H. D. Rouse) ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে উহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

১ (১) লুই দ লা ভালে পুসেঁর ফরাসী অনুবাদ (Published in the Revue d'histoire et de littérature religieuses (Vols. X-XII. 1905-1907) (২) এল, ডি, বারনেটের (L.D. Barnett) এর ইংরেজী অনুবাদ (London, 1909) লুই ফিনোর (Louis Finot) ফরাসী অনুবাদ (Paris, 1920) তুচ্চির (G. Tucci) ইটালীয় অনুবাদ ও শ্মিড্ট এর (Schmidt) জার্মান অনুবাদ। এই কয়টি অনুবাদের সংবাদ আমরা জানি। ইহার মধ্যে ফিনো ও বারনেটের অনুবাদ দেখিয়াছি।

বোধিচর্যাবতারও সেণ্টপিটর্সবার্গেই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক মিনায়েভ (I. P. Minaev) কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় (Zapiski, Vol. IV, 1889, pp. 155-225)। এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রকাশন-সমিতির পত্রিকায় (Journal of the Buddhist Text Society, Vol. II, 1894) পুনঃ প্রকাশিত হয়।

ইহার পর ১৯০২-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক লুই দ লা ভালে পুসেঁ (Louis de la Vallée Poussin) প্রজ্ঞাকরমতির ভাষ্যসহ বোধিচর্যাবতার সম্পাদন করেন এবং "বঙ্গীয় এসিয়া সমিতি" (Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1902-14) কর্তৃক উহা প্রকাশিত হয়। বোধিচর্যাবতারের এই সংস্করণেরই সর্বত্র বহুল প্রচার হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ইহাও অপ্রাপ্য (out of print)।

অধ্যাপক পুসেঁর এই গ্রন্থখানি খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৩৩টি শ্লোকের মধ্যে প্রথম ২২টি, ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৪৮ শ্লোকের মধ্যে মাত্র শেষ তিনটি এবং অষ্টম পরিচ্ছেদের ১৮৬ শ্লোকের মধ্যে মাত্র প্রথম ১০৮ শ্লোক ইহাতে পাওয়া যায়। দশম পরিচ্ছেদ একেবারেই নাই।

এই খণ্ডিত গ্রন্থেরই একখানি আমাদের বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে আছে। ইহারই আমরা অনুবাদ করিয়াছিলাম। অনুবাদ যখন প্রায় ছাপা শেষ—তখন ঘটনাচক্রে দুই জায়গা হইতে বাকি শ্লোকগুলি আমার হস্তগত হইল। আমার বন্ধু ও সহকর্মী ভদন্ত শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী তাঁহার ভ্রমণকালে প্রাপ্ত উক্ত বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রকাশন-সমিতির পত্রিকা হইতে ঐ শ্লোকগুলি নকল করিয়াছিলেন[১]। তিনি হঠাৎ সিংহল হইতে আসিলেন এবং আমাকে ঐ সংবাদ দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুবাদ আরম্ভ করিলাম। ঠিক এমনি সময়েই আমার ছাত্র সংস্কৃত-শিক্ষার্থী চীনভিক্ষু শুক্লপ্রজ্ঞ (পে-হুয়ে) আমাকে উক্ত পত্রিকার কয়েকটি পৃষ্ঠা দিলেন। উহা তিনি কলিকাতায় পুরাণ পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ইতিমধ্যেই ছাপা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহাদের অবশিষ্টাংশ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। অষ্টম পরিচ্ছেদের অবশিষ্টাংশ অতুলনীয়—এবং অভিনব। এই ভাব প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্যত্র পাওয়া যায় না। মহাযান সম্প্রদায়েরই ইহা বৈশিষ্ট্য।

নবম পরিচ্ছেদ দার্শনিক আলোচনায় পূর্ণ বলিয়া উহা আমরা ইহার সহিত যোগ করা সমীচীন মনে করিলাম না। উহার ও দশম পরিচ্ছেদের অনুবাদ পৃথকভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে দুইজন আত্মত্যাগী বোধিসত্ত্বের জীবনী দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে সুপুষ্পচন্দ্রের কাহিনী প্রজ্ঞাকরমতির ভাষ্য ও সমাধিরাজ-সূত্র হইতে এবং আর্যদেবের কাহিনী চীনভাষায় রক্ষিত দুইখানি নথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা পূর্বে প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯), প্রকাশিত হয়।

---

১ ভদন্ত শান্তিভিক্ষু বোধিচর্যাবতারের একটি হিন্দি অনুবাদ করিয়াছেন। আশা করি উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

পাদটীকায় প্রায় সর্বত্র কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তথাপি আরও অনেক শব্দ ও পরিভাষার ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে হওয়ায়, পরিশিষ্টে "দীপিকা"তে তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

তর্জমা যাহাতে যতদূর সম্ভব মূলানুগত অথচ সরস ও প্রাঞ্জল হয়, এবং ভাষা যাহাতে অনুবাদগন্ধী না হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি জানি না।

বক্তব্য ভাব স্পষ্ট করিবার জন্য অনেকস্থলে এমন সব পংক্তি যোগ করিতে হইয়াছে, যাহা মূলে নাই। এরূপ পংক্তিসমূহ উদ্ধৃত বচনের ন্যায় যতদূর সম্ভব " " এতাদৃশ চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদের ১০৮ শ্লোক পর্যন্ত এইরূপ করিয়াছি। এইরূপ চিহ্নিত পংক্তির অধিকাংশই প্রজ্ঞাকরমতির ব্যাখ্যা হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। অনুবাদও প্রায় সর্বত্র প্রজ্ঞাকরমতির ভাষ্যানুযায়ীই করিয়াছি।

বিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের (গবেষণা-বিভাগের) নবীন শিক্ষার্থী মাত্র, তখন এই অপূর্ব গ্রন্থ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখনই আমি উহার অনুবাদ আরম্ভ করি এবং উহার কথা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে বলি। তিনি আমাকে সাধু ভাষায় উহার অনুবাদ করিবার নির্দেশ দেন এবং ছন্দোবদ্ধ (অর্থাৎ পদ্য-) অনুবাদ নিষেধ করেন।

নানা কারণে এই অনুবাদ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। তাহার উপর আবার যখন পণ্ডিতপ্রবর স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্যের অনুবাদ প্রকাশিত হইল, তখন উহা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিবার উৎসাহ স্তিমিত হইয়া পড়িল।

কিছুকাল পূর্বে, আমার এই অনুবাদের কথা বিশ্বভারতীর "গবেষণা-সমিতির" পরিচালকবর্গের শ্রুতিগোচর হয়। তাঁহারা ইহা প্রকাশের অভিপ্রায়ে অনুবাদ অবিলম্বে সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমাকে তাগিদ দেন। তাঁহাদের ঐ তাগিদেই অনুবাদ সম্পূর্ণ হইল এবং তাঁহাদের জন্যই ইহার প্রকাশও সম্ভব হইল।

ভূমিকা

ভগবান গৌতম বুদ্ধ তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। এই বোধিসত্ত্বাবস্থায়, সমস্ত জীবের হিতসুখবিধানের জন্য নিজ প্রাণ পর্যন্ত বলিদান দিতে তিনি সর্বদা উদ্যত রহিতেন। জাতকে কথিত বুদ্ধের পূর্ব জন্মের আখ্যানসমূহ হইতে বোধিসত্ত্বের আদর্শের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ কী তাহা দেখা যাক।

"বোধি বা বুদ্ধত্বের জন্য যে-প্রাণী (সত্ত্ব)", অর্থাৎ যে-প্রাণী ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, তিনিই বোধিসত্ত্ব।

শাস্ত্রে আছে, বুদ্ধত্বলাভের জন্য প্রথমে "বোধিচিত্ত" উৎপন্ন করিতে হইবে। "সমস্ত প্রাণিগণের উদ্ধারের অভিপ্রায়ে, বোধিপ্রাপ্তির জন্য যে-সংকল্প [এবং (কেবল সংকল্প মাত্র নহে) তাহার জন্য যে-উদ্যম] তাহাই বোধিচিত্ত।"

এই বোধিচিত্ত উৎপাদন পূর্বক, বোধি বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যে-চর্যা বা আচার পালন করিতে হয় তাহার পদ্ধতি (অবতার) এই "বোধিচর্যাবতার" গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বোধিচিত্তের প্রশংসা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে— বোধিচিত্ত গ্রহণাভিলাষী সাধক, বুদ্ধ, ধর্ম, ও পূর্ব বোধিসত্ত্বগণের পূজা করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট নিজের পূর্বকৃত পাপ অকপটভাবে প্রকাশপূর্বক, তাঁহাদের শরণ লইতেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বোধিচিত্ত বরণ করিতেছেন, সর্বজগতের সর্বপ্রাণীর হিতসুখবিধানের জন্য, নিজের সর্বস্ব, নিজের জীবন, এমন কি নিজের সমস্ত কুশলকর্মের ফল পর্যন্ত দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে চিত্তকে প্রমাদ ও স্খলন হইতে কিভাবে রক্ষা করিতে হয়, তাহাকে রাগ, দ্বেষ ও মোহ হইতে মুক্ত করিয়া কিভাবে সম্পূর্ণ বশীভূত রাখা যায়, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ক্ষমাগুণের (ক্ষান্তিপারমিতার) প্রশংসা এবং উহা অর্জনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা আছে। নানা যুক্তি তর্কের দ্বারা ক্ষমা অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার বিষয় এরূপ হৃদয়ংগমভাবে এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে যে উহা পাঠ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় এবং গ্রন্থকারের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদে বীর্যপারমিতার বিষয় উক্ত হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব বীর সাধক। সংসারের সর্বজনের সর্বদুঃখ তিনি বরণ করেন। সকলের হিতসুখ সাধনের জন্য তিনি নিজ প্রিয়জন, নিজ আকাঙ্ক্ষিত ধন, সর্বস্ব পরিত্যাগ করেন। হস্তপদাদি অঙ্গ তাঁহার ছিন্ন হয়, জলন্ত সংদংশিকার দ্বারা চক্ষু তাঁহার উৎপাটিত হয়। বীর্য বিনা এরূপ সাধনা সম্ভব নহে।

বলা হইয়াছে, বীর্যেই বোধি অবস্থান করিতেছে। বায়ু বিনা যেমন গতি সম্ভব নহে— সেইরূপ বীর্য বিনা কোনো শুভ কর্মই সম্ভব নহে।

অষ্টম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় ধ্যানপারমিতা। সংসারের ভোগসুখ যে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ, উহা যে কিরূপ কদর্য, কুৎসিত, অকাট্য যুক্তি সহকারে জীবন্তরূপে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, কদর্য ভোগসুখের জন্য, প্রাণিগণ জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া যে-পরিমাণ পরিশ্রম করে এবং যে-দুঃখ সহ্য করে, তাহার তুলনায়, অতি অল্প পরিশ্রমে, অতি অল্প দুঃখ সহ্য করিয়াই তাহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে। ইহা প্রদর্শন করত সংসারের এই তুচ্ছ ভোগসুখের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইভাবে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে সংসারের কর্ম-কোলাহল হইতে দূরে গিয়া, নির্জনে চিত্ত-বিক্ষেপ দমনপূর্বক ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে। এই ধ্যানের উদ্দেশ্য হইবে পরাত্মসমতা বা সমদর্শন :

"আমার সুখ বা দুঃখ আমার মনে যে-ভাব উৎপন্ন করে, অন্যের সুখ বা দুঃখ তাহার মনে সেই ভাবই সৃষ্টি করে। অতএব যখন সুখ দুঃখ সকলেরই সমান, তখন সকলকেই আমার নিজের ন্যায় রক্ষা করা উচিত।

"কর চরণ মস্তকাদি নানা অঙ্গভেদে বহুরূপবিশিষ্ট এই দেহকে যেমন আমাদের এক মনে করিয়া পালন করিতে হয়, সমান সুখদুঃখান্বিত জীবজগৎকেও সেইরূপ এক মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। করচরণাদির সুখদুঃখ যেমন আমার নিকট ভিন্ন নহে এক, সমস্ত জগতের সুখদুঃখও তেমনি ভিন্ন নহে এক।

"সকলের দুঃখই দুঃখ। সেইজন্যই নিজের দুঃখের ন্যায় অন্যের দুঃখও আমাকেই ধ্বংস করিতে হইবে।

"আমি যেমন প্রাণ-বান, অন্য প্রাণীও সেইরূপ প্রাণ-বান, সেইজন্যই নিজের ন্যায় অন্য প্রাণীকেও আমায় দয়া করিতে হইবে।

"আমার নিকট আমার সুখ যেমন প্রিয়, অন্যের নিকটেও তাহার সুখ তেমনি প্রিয়। আমার যেমন ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে, অন্যেরও সেইরূপ ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে। অতএব অন্য হইতে আমার প্রভেদ কোথায়।"

নবম পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তু প্রজ্ঞাপারমিতা। উহার অনুবাদ করা হয় নাই। ঐ পরিচ্ছেদে শূন্যবাদী গ্রন্থকার শূন্যবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই শূন্যবাদ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের এমন কি পণ্ডিতদেরও ধারণা বড় অদ্ভুত। ইহাকে তাঁহারা সর্বনাস্তিত্ববাদ, উচ্ছেদবাদ বা নিহিলিস্‌ম্ (Nihilism) বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন।

দেখা যাইতেছে 'শূন্য' শব্দটিই শূন্যবাদকে বুঝিবার বাধা বা ভুল বুঝিবার কারণ হইয়াছে। এই শূন্য বা শূন্যতা শব্দ যে অভাবাত্মক নহে, তাহা শূন্যবাদী অতি স্পষ্টরূপেই বলিয়া গিয়াছেন :

"'অভাব' শব্দের যে-অর্থ 'শূন্যতা' শব্দের সে-অর্থ নহে। 'অভাব' শব্দের অর্থ 'শূন্যতা' শব্দের উপর আরোপ করিয়া, আপনি অনর্থক আমাদের দোষ দিতেছেন।"[১]

১ ন পুনরভাবশব্দস্য যোঽর্থঃ স শূন্যতাশব্দস্যার্থঃ। অভাবশব্দার্থং চ শূন্যতার্থমিত্যধ্যারোপ্য ভবানস্মানুপালভতে। নাগার্জুনকৃত-মূলমধ্যমককারিকার—চন্দ্রকীর্তিকৃতবৃত্তি, ২৪।৭।

অভাব অর্থে যে "শূন্যতা" শব্দের প্রয়োগ হয় নাই, তাহা "প্রমাণিত" হইল। সুতরাং "শূন্যতা" সর্বনাস্তিত্ববাদ বা উচ্ছেদবাদ নহে।

যাহা কিছু "আপেক্ষিক" (Relative) অন্যসাপেক্ষ অন্যাশ্রিত, "পরতন্ত্র" (Dependent) যাহার উৎপাদ, নিরোধ, অস্তিত্ব, সমস্তই অন্যের উপর (অর্থাৎ তাহার হেতু ও প্রত্যয়ের উপর) নির্ভর করিতেছে, সেই জগৎ-প্রপঞ্চের নিরসনই শূন্যবাদের—উদ্দেশ্য।

"সমস্ত প্রপঞ্চের উপশমহেতু "শূন্যতার" উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তুমি তাহা না বুঝিয়া, শূন্যতার নাস্তিত্ব অর্থ কল্পনা করিয়া প্রপঞ্চজালই বৃদ্ধি করিতেছ। "শূন্যতার" প্রয়োজন বুঝিতে পারিতেছ না। প্রপঞ্চ নিবৃত্তিশীল "শূন্যতার" নাস্তিত্ব কোথায়।"[১]

প্রশ্ন উঠিবে, প্রপঞ্চের নিরসনই শূন্যতার উদ্দেশ্য তাহা তো বোঝা গেল; কিন্তু প্রপঞ্চাতীত কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন শূন্যবাদ করে কিনা, এবং তাহা করিয়া থাকিলে, সেই কোনো কিছু কী, তাহার বর্ণনা শূন্যবাদী করিয়াছেন কি।

শূন্যবাদী বলেন—"প্রপঞ্চাতীতের বর্ণনা সম্ভব নহে। সর্বপ্রকার জ্ঞানের অতীত হওয়ায়, উহা বর্ণনাতীত। কোনো প্রকারেই উহাকে বুদ্ধির বোধগম্য করা যায় না। কেমন করিয়া উহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিব।

"সর্ব-উপাধি-বর্জিত[২] বলিয়া, সেই প্রপঞ্চ-বিনির্মুক্ত পরমার্থ-সত্যতত্ত্বকে কোনো প্রকার কল্পনার দ্বারাও ধারণা করা যায় না। কল্পনার অতীত বলিয়া, উহা শব্দেরও বিষয়ীভূত নহে। শব্দ হইতেছে কল্পনা বা ভাবের প্রকাশক; যাহা কল্পনা বা ভাবের অতীত, তাহা কেমন করিয়া শব্দের বিষয় হইবে। অতএব সর্বপ্রকার কল্প, বিকল্প, ভাব, ভাষা, ভাষণ-বিহীন-হেতু, আরোপবিরহিত, সংবৃতি-বিবর্জিত, অব্যবহার্য, অনভিলাপ্য, অনির্বচনীয়, পরমার্থতত্ত্ব কিরূপে প্রতিপাদন করিব।"[৩]

"পরমার্থসত্য যদি, কায়, বাক্ বা মনের বিষয়ীভূত হইত, তাহা হইলে তাহাকে আর পরমার্থ-সত্য বলা যাইত না। তাহা সংবৃতিসত্যই হইয়া যাইত। অতএব উহা সর্ব কল্পনার অতীত। সর্ব বিশেষণের বহির্ভূত। ভাব, অভাব, স্বভাব, পরভাব, সত্য, অসত্য, শাশ্বত, উচ্ছেদ, নিত্য, অনিত্য, সুখ, দুঃখ, শুচি, অশুচি, আত্মা, অনাত্মা, শূন্য, অশূন্য, একত্ব, অন্যত্ব, উৎপাদ, নিরোধ, ইত্যাদি কোনো বিশেষণই, কোনো শব্দই পরমার্থসত্য সম্বন্ধে

---

১ অতো নিরবশেষপ্রপঞ্চোপশমার্থং শূন্যতোপদিশ্যতে। তস্মাৎ সর্বপ্রপঞ্চোপশমঃ শূন্যতায়াঃ প্রয়োজনং। ভবাংস্তু নাস্তিত্বং শূন্যতার্থং পরিকল্পয়ন্ প্রপঞ্চজালমেব সংবর্ধয়মানো ন শূন্যতায়াং প্রয়োজনং বেত্তি। অতঃ প্রপঞ্চনিবৃত্তিস্বভাবায়াঃ শূন্যতায়াং কুতো নাস্তিত্বং। ঐ, ২৪।৭।

২ তুলনীয়—দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে, নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতং চ সর্বোপাধি-বর্জিতম্।

ব্রহ্মের দুইটি রূপ। একটি হইতেছে, নাম-রূপ-বিকার-ভেদ-উপাধি-সমন্বিত এবং অপরটি হইতেছে—তাহার বিপরীত, সর্ব-উপাধি-বর্জিত। বেদান্ত-দর্শন, শাঙ্করভাষ্য, ১।১।১১।

৩ তুলনীয়—নির্গুণের স্তবীকরণ সম্ভব নহে। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩১৫।১।

প্রয়োগ করা যায় না। উহা অনভিলাপ্য, অনাজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়, অবিজ্ঞেয়, অদেশিত, অপ্রকাশিত। উহা অক্রিয়, অকরণ ইত্যাদি।"[১]

ইহা হইতে বোঝা যাইবে, প্রপঞ্চাতীত কোনো তত্ত্বে শূন্যবাদীর বিশ্বাস নাই বলিয়াই যে সে-বিষয়ে তিনি মৌন রহিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু প্রপঞ্চাতীত পরমতত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়াই তিনি সে সম্বন্ধে নীরব থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উপনিষদের ঋষিগণও বলিয়াছেন—

"বাক্য ও মন যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে,[২] যেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন পৌঁছায় না—তাহাকে কেমন করিয়া বোঝানো যায়, জানিনা, বুঝিতে পারিতেছি না।" কেনোপনিষদ, ১।৩।

সুতরাং সেই প্রপঞ্চাতীত পরমতত্ত্ব যাহাকে 'নির্গুণ', 'নির্বিকল্প', 'ভূম-ব্রহ্ম', 'কেবল', বা ইংরেজীতে অ্যাব্সলিউট (Absolute) সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে অতি সামান্য কিছু আভাস দেওয়ার একমাত্র উপায় হইতেছে—তাহা, "ইহা নয়," "উহা নয়" "এমন নয়" "তেমন নয়" ইত্যাদি নেতিবাচক শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ করা। উপনিষদের এবং শূন্যবাদের ঋষিগণ তাহাই করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ উপনিষদাদি ও শূন্যবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ হইতে কিছু কিছু পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়া, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্, অমন, অতেজঃ, অপ্রাণ, অমুখ, অগাত্র, অনন্তর, অবাহ্য।" বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮।

"অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, অজ, অজর, অমর, অমৃত।" বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৯; ৪।৪।২৫।

"অনাদি, অমধ্য, অনন্ত।" মহা, শান্তি, ২০৬।১৩।

"অদুঃখ, অসুখ।" ঐ, ২৫০।২২।

"না সুখ, না দুঃখ…" বোধি, নবম, পৃ ৩৬৭।

"অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ধ্রুব।" কঠোপনিষদ, ৩।১৫।

---

১ বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা, নবমপরিচ্ছেদ, পৃ, ৩৬৩, ৩৬৬—৭।

তুলনীয়—অদৃষ্ট, অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত। বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩।

তাহার কার্য নাই, করণ নাই। শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮।

তিনি নিষ্ক্রিয়। ঐ, ৬।১৯।

২ শ্রুতিতে পাওয়া যায়, বাষ্কলি বাহ্বকে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নীরবতা, বা নিরুত্তরতার দ্বারাই, সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। বেদান্তদর্শন, শাঙ্করভাষ্য, ৩।২।১৭।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও আছে, মঞ্জুশ্রী অদ্বয়তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, নানা জনে নানা বর্ণনা দিতে থাকেন। কিন্তু বিমলকীর্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি একেবারে নীরব থাকেন। তখন মঞ্জুশ্রী বলিয়া উঠেন—"সাধু, সাধু, আপনিই অদ্বয়তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন। অদ্বয়তত্ত্বে প্রবেশ করিলে, মানুষ বাক্য হারাইয়া ফেলে।"

The Eastern Buddhist, No 2. Vol. IV, 1927.

"সর্বব্যাপী, শুক্র (দীপ্তিমান), অব্রণ (অক্ষত), অস্নাবু, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।" বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৪০।৮।

"অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্ম-প্রত্যয়-সার, প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত।" মাণ্ডূক্যোপনিষদ, ১।৭।

"অ-পর-প্রত্যয়, শান্ত, প্রপঞ্চোপশম, শিব।" মূলমধ্যমককারিকা, ১; ১৮।৭।

"অনিরোধ, অনুৎপাদ, অনুচ্ছেদ, অশাশ্বত,[1] অনেকার্থ, অনানার্থ, অনাগম, অনির্গম।" ঐ, ১।

"অনিরোধ, অনুৎপত্তি, অশাশ্বত, অনুচ্ছেদ।" মাণ্ডূক্যকারিকা, ২।৩২; ৪।৫৭।

"নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, দগ্ধ-ইন্ধন-অনলোপম।" বেদান্তদর্শন, ১।১।১১।

"অনভিলাপ্য, অনাজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়,অবিজ্ঞেয়,অদেশিত,অপ্রকাশিত, অক্রিয়, অকরণ।" বোধিচর্যা, ৯ম, পৃ, ৩৬৭।

"অদৃষ্ট, অশ্রুত,অমত,অবিজ্ঞাত। বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২৩। নিষ্ক্রিয়, কার্য নাই, করণ নাই।" শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮, ১৯।

"অস্পর্শ, অগ্রাহ্য, অশ্বেত, অপীত, অরূপ, আকাশোপম, শুদ্ধস্বভাব, অশীতল, অনুষ্ণ, অকঠোর, অকোমল, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অবৃত্ত, অত্রিকোণ। অস্থূল, অসূক্ষ্ম, অকৃষ্ণ, অলোহিত, অবর্ণ, নিরাকার, অদৃশ্য, শান্ত। অনুপম, অচিন্ত্য, অদৃশ্যপরমপদ, প্রপঞ্চাতীত, নির্বিকার, প্রভাস্বর।" নৈরাত্ম্য-পরিপৃচ্ছা, পৃ, ১৪-১৫, ২০।

উপনিষদাদি ও শূন্যবাদশাস্ত্রের ঐ বচনসমূহের মধ্যে এরূপ মিল এবং সাদৃশ্য যে একের বচন অন্যের বলিয়া অনায়াসেই চালাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও অতি সাবধানী শূন্যবাদী পরমার্থ সম্বন্ধে অভাবাত্মক ব্যতীত ভাবাত্মক শব্দ প্রয়োগের অত্যন্ত বিরোধী তথাপি উপনিষদের ঋষিদেরই মতো, তিনি কোথাও কোথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা প্রকৃতিশুদ্ধ, শান্ত, শিব, প্রভাস্বর।

শূন্যবাদ যে ভাবাত্মক তাহা আরও পরিষ্কার করিবার জন্য প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার আচার্য চন্দ্রকীর্তির ভাষ্য হইতে আর একটি পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পরমার্থস্বভাব হইতেছে— সর্বদ্রষ্টব্যপ্রশমিত, শিবলক্ষণযুক্ত (শান্তপ্রকৃতি), সর্বকল্পনাজালবিরহিত; জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তস্বভাবসমন্বিত শিব। পরমার্থ— অজর, অমর, অপ্রপঞ্চ, শূন্যতাস্বভাববান্ নির্বাণ। মন্দবুদ্ধি এবং অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদি[2] মতবাদে অভিনিবিষ্ট বলিয়া, অজ্ঞজন ইহাকে দেখিতে পায় না।"[3]

---

১ তুলনীয়—এমন অবস্থায় শাশ্বতই বা কী। আর উচ্ছেদই বা কী। মহাভারত, শান্তি, ২১৭।৩১।

২ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে। বেদান্তদর্শন, ৩।২।১৭। "সেই অনাদি পরব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না।"

৩ দ্রষ্টব্যোপশমং শিবলক্ষণং সর্বকল্পনাজালরহিতং জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তিস্বভাবং শিবং পরমার্থস্বভাবং। পরমার্থমজরমমরমপ্রপঞ্চং নির্বাণং শূন্যতাস্বভাবং তে ন পশ্যন্তি মন্দবুদ্ধিতয়া। অস্তিত্বং নাস্তিত্বং চাভিনিবিষ্টাঃ সন্ত ইতি। মূলমধ্যমক, ৩।৮।

সর্বপ্রকার আসক্তির বিনাশসাধনই হইতেছে শূন্যতার উদ্দেশ্য। কেবল ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়াসক্তিমাত্র নহে, নানাপ্রকার মতবাদের আসক্তি হইতে উদ্ধার করাও শূন্যবাদের উদ্দেশ্য।

সর্বপ্রকার মতবাদের আসক্তি নিরসনের জন্য যখন শূন্যবাদের উৎপত্তি, তখন শূন্যবাদের প্রতি আসক্তিও শূন্যবাদের উদ্দেশ্য-বিরোধী।

শূন্যবাদী বলেন—"সর্বপ্রকার মতবাদের বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, জিনগণ শূন্যতার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং যাহারা শূন্য-মতবাদে আবদ্ধ তাহাদের মুক্তির আর আশা নাই। উহা সাধ্যের বাহিরে।"[১]

"শূন্যতা হইতেছে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি রেচক ঔষধ। সর্বপ্রকার আভ্যন্তরিক কলুষ বাহির করাই উহার কার্য। কিন্তু তাহা বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে উহাও যদি স্বয়ং বাহির না হইয়া ভিতরে থাকিয়া যায়, তবে অবস্থা মারাত্মক হইয়া উঠে।" মূলমধ্যমক, ১৩।৮; চতুঃশতক, পরি, ১৬, পৃ, ২৭২।

এখন প্রশ্ন হইবে পরমার্থ যদি প্রপঞ্চাতীত বা নিষ্প্রপঞ্চস্বভাব, তবে স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন, চতুরার্যসত্য, দশপারমিতা, মৈত্রী, করুণা-মুদিতা ইত্যাদির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কেন। এ সমস্তই তো তত্ত্বের বিপরীত,—অতত্ত্ব। যাহা অতত্ত্ব তাহা অ-গ্রাহ্য—পরিত্যাজ্য।

শূন্যবাদী বলেন, প্রপঞ্চ পরমার্থসত্য বা পরমতত্ত্ব নহে—ইহা ঠিক। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে ইহার অস্তিত্ব থাকায়, বা লোকচক্ষে ইহা সত্য বোধ হওয়ায় (ইহা পরমার্থসত্য বা Absolute Reality না হইলেও) ইহাকে ব্যবহারসত্য[২] (বা Empirical or Pragmatic Reality) বলা হয়। এই ব্যবহারসত্যকে শাস্ত্রে সংবৃতিসত্য বা লোক-সংবৃতিসত্য বলা হইয়াছে।

ইহা সংবৃতি অর্থাৎ আবরণ। কেননা, পরমতত্ত্বকে ইহা সর্ব দিকে আবৃত, আচ্ছাদিত, বা সংবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

এই আবরণ—এই মোহ, ছিন্ন করিয়া, সেই পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

কিন্তু ব্যবহার (-সত্য) কে আশ্রয় না করিয়া, অস্বীকার করিয়া পরমার্থ সত্যের জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। সুতরাং ব্যবহার (-সত্য) কে অবলম্বন করিয়াই পরমার্থসত্যে পৌঁছাইতে হইবে। মূলমধ্যমক, ২৪।১০।

১ শূন্যতা সর্বদৃষ্টীনাং প্রোক্তা নিঃসরণং জিনৈঃ। যেষাং তু শূন্যতাদৃষ্টিস্তানসাধ্যান্ বভাষিরে॥
সর্বসংকল্পহানায় শূন্যতামৃতদেশনা। যস্ত তস্যামপি গ্রাহস্ত্বয়াসাবসাদিতঃ।
মূলমধ্যমক, ১৩।৮, বোধি, পৃ, ৩৫৯ ; ৪১৪-৫। চতুঃশতক, পরি, ১৬, পৃ, ২৭২।

২ জাগ্রত হওয়ার পূর্বে মানুষ যতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতে থাকে, ততক্ষণ যেমন স্বপ্নকে সত্য বলিয়াই অনুভব করে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত, এই জগৎ ও জাগতিক সর্ব ব্যবহারকে মানুষ সত্য বলিয়াই অনুভব করে। সুতরাং অদ্বৈত বা ব্রহ্ম জ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত, লোকব্যবহারও সত্যরূপে স্বীকৃত হইতেছে। বেদান্ত, শাঙ্করভাষ্য, ২।১।১৪।

কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টক উদ্ধার করা হয়, বিষের দ্বারা যেমন বিষ নষ্ট করা হয় সেইরূপ মোহের দ্বারাই মোহকে ধ্বংস করিতে হইবে।

শূন্যবাদী বলেন—"মোহ দুই প্রকার। এক প্রকার মোহ সংসার প্রবৃত্তির কারণ, আর অন্যপ্রকার মোহ সংসার নিবৃত্তির কারণ।" বোধি, ৯।৭৭ ; পৃ, ২৯০।

এই দুই মোহের মধ্যে দ্বিতীয় মোহকে অবলম্বন করিয়াই— সর্বমোহাতীত, সর্বদুঃখাতীত, পরমার্থসত্য লাভ করিতে হইবে।[১]

[চতুরার্যসত্য, দশপারমিতা প্রভৃতি এবং] জীবের প্রতি করুণাকে শূন্যবাদী এই দ্বিতীয় প্রকার মোহের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মোহ— কেননা, পরমার্থত জীব বলিয়া কিছু নাই। মোহের দ্বারা কল্পিত— এক "কল্পিত বস্তু" হইল জীব। সুতরাং তাহার প্রতি করুণা, মোহ ব্যতীত আর কিছু নহে। কিন্তু কণ্টক যেমন কণ্টক উদ্ধার করে, সেইরূপ এই মোহই সর্ব মোহ হইতে উদ্ধার করিবে।

মহাযান বৌদ্ধধর্মে এই করুণার স্থান অতি উচ্চে। বলা হইয়াছে, সমস্ত বুদ্ধধর্ম এই করুণার অন্তর্গত। 'করুণা যেখানে, সমস্ত বুদ্ধধর্ম সেখানেই'। বোধিচর্যাবতার, ৯।৭৬।

এই করুণা কিরূপ। "আর্তে সুত ইব পিতুঃ প্রেম জগতি" আর্ত পুত্রের প্রতি পিতার যেমন প্রেম, সমস্ত জগতের প্রতি সেইরূপ প্রেমই হইল—এই করুণা। বোধিচর্যাবতার।৯।৭৬।

এই মহাকরুণা যাঁহার মধ্যে উৎপন্ন হয়, তাঁহার স্বার্থবুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তই পরের জন্য :

"তাঁহার ধর্মজীবন, তাঁহার চরিত্ররক্ষা, স্বর্গের জন্য, বা ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য নহে। নিজের কোনো ভোগ, কোনো ঐশ্বর্য, দেহের কোনো বর্ণ, রূপ বা সৌন্দর্য লাভের জন্য নহে। যশের জন্য নহে। কিংবা পশুজন্ম বা নরকাদির ভয়েও নহে। সর্বজীবের হিতের জন্য, সুখের জন্য, কল্যাণের জন্যই তাঁহার ধর্মজীবন। তাঁহার চরিত্ররক্ষা।" শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ, ১৪৭ ; মৈত্রীসাধনা, পৃ, ১৮।

"তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের পরম কল্যাণের উৎস পর্যন্ত জীবগণকে দান করেন। অথচ তাহার কোনো প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেন না।

"তিনি সর্বপ্রথম জগতের জন্য সমস্ত প্রাণীর জন্য বোধি আকাঙ্ক্ষা করেন—নিজের জন্য নহে।" শিক্ষা, পৃ, ১৪৬ ; মৈত্রীসাধনা, পৃ, ১৭।

"গুণবান্ একমাত্র পুত্রের উপর যেমন গৃহস্থ ব্যক্তির মজ্জাগত প্রেম, মহাকরুণা লাভ করিয়াছেন যিনি, তাঁহারও সমস্ত প্রাণীর উপর সেইরূপ মজ্জাগত প্রেম।" শিক্ষা, পৃ, ২৮৭ ; মৈত্রী, পৃ, ১৩।

"সেইজন্য যখন তাঁহার দেহ ছিন্ন হইতে থাকে, তখনও তিনি সর্বপ্রাণীর উপর মৈত্রী

---

১ অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। বাজসনেয়িসংহিতা, ৪০।১৪। "ইহা মোহ, অবিদ্যা, বা অজ্ঞান, অর্থাৎ পরমার্থজ্ঞান না হইলেও, ইহা দ্বারাই মৃত্যু পার হইয়া পরমার্থজ্ঞান লাভ করিবে। এবং তাহার পর সেই পরমার্থজ্ঞান বা যথার্থ বিদ্যা দ্বারা অমৃত উপভোগ করিবে।"

বিস্তার করেন। যাহারা তাঁহার দেহ ছিন্ন করিতে থাকে, তাহাদের উদ্ধারের জন্যই, তিনি শান্তভাবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেন।" শিক্ষা, পৃ, ১৮৭; মৈত্রী, পৃ, ১৮-১৯।

তিনি বলেন—"জীবজগতের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আমার সর্বজন্মের সর্বদেহ সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু, অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সর্বকালের, কুশলকর্ম নিরাসক্ত হইয়া ত্যাগ করিতেছি।" শিক্ষা, পৃ, ১৭; বোধি, ৩।১০।

"সর্বজীবের যথেচ্ছ সুখলাভের জন্যই আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিন্দা করুক, ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক, ক্রীড়া, হাস্য, বিলাসাদি, তাহাদের সুখকর যে-কোনো কার্য তাহারা করুক, তাহাদিগকেই এই দেহ সমর্পণ করিয়াছি।

"যাহারা আমাকে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবে, যাহারা আমার অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে বিদ্রূপ করিবে, তাহারা এবং অবশিষ্ট অন্য সকলেও যেন বুদ্ধত্ব লাভ করে।" বোধি, ৩।১২- ৬; মৈত্রী, পৃ, ২৪।

শত্রু মিত্র সকলকেই সমান ভাবিব কেমন করিয়া। আমার সর্বনাশ করিয়াছে যে, কেন আমি তাহাকে ক্ষমা করিব। আমার পরম শত্রুকেও ভালবাসিব কেন। কেন তাহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিব।

আমাদের মনে স্বভাবতই এই সব প্রশ্ন জাগে। শূন্যবাদী অতি মধুর মর্মস্পর্শীভাবে ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন :

"ক্রুদ্ধ ও প্রমত্ত মানব, কণ্টকাদির দ্বারা, নিজেই নিজেকে আঘাত করে। আহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকে। কেহ উদ্বন্ধনের দ্বারা, কেহ উচ্চস্থান হইতে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করিয়া, কেহ বিষাদি ভক্ষণ করিয়া আত্মহত্যা করে।

"কামক্রোধাদির অধীনতাহেতু হতভাগ্য জীব, যখন সংসারের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, আপনাকেই এই ভাবে আঘাত করে, তখন অপরকে আঘাত করিবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে।

"পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি, নানারূপ ক্ষতিকর কার্য করিলেও, আমরা তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই না। বরং তাহার উপর আমাদের দয়াই হয়। তাহা হইলে কামক্রোধরূপ পিশাচের দ্বারা গ্রস্ত যে-সমস্ত ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া ঐভাবে, অথবা পরাপকারাদি পাপাচরণের দ্বারা আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে, তাহাদের উপর দয়া না হইয়া, ক্রোধ হয় কিরূপে।" বোধি, ৬।৩৫—৩৮; মৈত্রী, পৃ, ৩২-৩৫।

"যখন কেহ দণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আমাকে আঘাত করে, তখন আমি ঐ দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না। ঐ দণ্ডাদি যাহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাহার উপরই ক্রুদ্ধ হই।

"মুখ্য দণ্ডাদিকে ত্যাগ করিয়া যদি আমি তাহার প্রেরকের উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে দ্বেষের প্রতিই আমার দ্বেষ হওয়া উচিত। কেননা, সেই দণ্ডাদির প্রেরকও দ্বেষের দ্বারাই প্রেরিত হয়।

"যাহার দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয়, সেই অস্ত্র এবং যেখানে আমি আঘাত পাই, আমার সেই দেহ—এই উভয়েই দুঃখের কারণ। অস্ত্রধারী অরি, এবং দেহধারী আমি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব।" বোধি, ৬।৪০, ৪৩; মৈত্রী, পৃ, ৩৭।

"এই অপকারিগণকে অবলম্বন করিয়া, ইহাদিগকে বার বার ক্ষমা করিতে করিতে, আমার সকল কলুষ দূর হয়, আমার চরিত্রের উৎকর্ষ হয়। এদিকে আমাকে অবলম্বন করিয়া, ইহাদের হিংসাদ্বেষাদি উৎপন্ন হওয়ায়, ইহারা দীর্ঘকাল নরকদুঃখ ভোগ করে।

"তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমিই ইহাদের অপকারী এবং ইহারা আমার উপকারী। ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া, হে খলচিত্ত, কেন তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ।

"ইহার দ্বারা আমার পুণ্যের বা সৎকার্যের বিঘ্ন হইল—এইরূপ মনে করিয়াও, কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কেননা, ক্ষমার সমান পুণ্য বা সৎকার্য নাই, এবং এই ব্যক্তির জন্যই সেই পুণ্য বা সৎকার্যের সুযোগ উপস্থিত হইল।

"অসহিষ্ণু আমি তখন যদি নিজের দোষে তাহাকে ক্ষমা না করি, তবে আমিই আমার পুণ্যের বা সৎকার্যের বিঘ্ন হইলাম। পুণ্যের সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পুণ্য অর্জন করিলাম না।

"দাতার যখন দান করিবার ইচ্ছা হয়, তখন যাচক উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা কি দানবিঘ্ন হয়। তাহা হইলে ক্ষমারূপ মহাপুণ্যের কারণ, অপকারী উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা পুণ্যের বিঘ্ন হইল, এমন কথা কেমন করিয়া বলি।

"দানেচ্ছু ব্যক্তির যাচকের অভাব হয় না। যাচক সংসারে সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু অনপরাধ, আমার অপকারী পাওয়াই দুর্লভ।

"সেই দুর্লভ বস্তু অশ্রমোপার্জিত নিধির ন্যায় স্বয়ং গৃহে আবির্ভূত হইয়াছে। বোধিচর্যার সহায়হেতু রিপু আমার আকাঙ্ক্ষার ধন। সদ্ধর্মের ন্যায় তিনিও আমার পুণ্য অর্জনের উৎস।" বোধি, ৬।৪৮-১০৭।

"যদি কেহ বলেন, ক্ষমাসিদ্ধির দ্বারা আমার পুণ্য অর্জন হউক, এরূপ শুভ অভিপ্রায় আমার শত্রুর নাই। উপরন্তু তাহার অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে।

"ইহার উত্তর এই যে, অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়াই তো, শত্রু ক্ষমাসিদ্ধির কারণ। অপকারের অভিপ্রায় না লইয়া, যদি বৈদ্যের মতো তিনি আমার হিতচেষ্টা করিতেন, তবে কি তাঁহার উপর আমার দ্বেষের সম্ভাবনাই থাকিত, না ক্ষমার প্রসঙ্গ উঠিত। আমার ক্ষমাসিদ্ধি হইত কিরূপে।

"তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়াই, আমার ক্ষমা উৎপন্ন হয়। অতএব তিনিই ক্ষমার কারণ। সদ্ধর্মের ন্যায় তিনিও আমার পূজনীয়।" বোধি, ৬।১০৯-১১।

মহাকারুণিক মহামানবগণের চরিতসমূহ অপূর্ব, অলৌকিক। অতি তীব্রদুঃখও তাঁহাদিগকে দুঃখ দিতে পারে না। জীবগণের জন্য বার বার নরকবাসেও তাঁহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।[১] তাঁহারা বলেন—

"অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে, সেই জীবলোকসমূহে যত জীব আছে, যতদিন পর্যন্ত সেই সমস্ত জীব মুক্তিলাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত এইভাবে আমি তাহাদের সেবা করিব।" মৈত্রীসাধনা, পৃ, ২৪।

---

১ মহাযানসূত্রালংকার, ১৩।১৩।

"একটি প্রাণীর জন্যও সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত, এই জগতে অবস্থান করিব।" ঐ পৃ, ৬২।

কোথা হইতে তাঁহারা এই শক্তি পান। তাঁহাদের এই অপূর্ব শক্তির উৎস কোথায়। কোন ধনে ধনী হইয়া তাঁহারা মোক্ষ পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

সে রহস্য তাঁহারা নিজেরাই উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন—

"জীবগণ যখন দুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে থাকে, তখন প্রাণে যে-আনন্দসাগরের সৃষ্টি হয়, তাহাই তো পর্যাপ্ত। রসহীন শুষ্ক মোক্ষে কী প্রয়োজন।" বোধি, ৮।১০৮, শিক্ষা, পৃ, ৩৬০।

ইহাই—সেই প্রাচীন-অর্বাচীন নানাজন-লাঞ্ছিত, বিবিধবিড়ম্বিত—শূন্যবাদ।

বুদ্ধের সেবাধর্ম ও উপনিষদের অধ্যাত্মধর্মের অপূর্ব মিলন হইয়াছে এই শূন্যবাদে। এই শূন্যবাদ জগতের বহু শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতেছে।

শান্তিদেবের
বোধিচর্যাবতার

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্মকায় ও সুত সহ সুগতগণকে[১] এবং অন্য সমস্ত বন্দনীয় ব্যক্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সুগতাত্মজ বোধিসত্ত্বের সাধনমার্গ[২] শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব ॥১॥

এ বিষয়ে আমার নূতনকিছু বলিবার নাই। এবং রচনানৈপুণ্যও আমার নাই। অতএব ইহার দ্বারা পরের উপকার করিবার কল্পনাও আমার নাই। নিজের চিত্তকে সুবাসিত করিবার জন্যই আমার এই গ্রন্থ প্রণয়ন ॥২॥

ইহার দ্বারা, আমার কুশল-ভাবনার উৎস— চিত্তপ্রসাদ, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমার সমান প্রকৃতির অন্য কেহ যদি ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলেও ইহা সার্থক হইবে ॥৩॥

পুরুষার্থ-সাধন-কারী এই দুর্লভ ক্ষণসম্পদ[৩] কোনো প্রকারে লাভ করিয়াছি। এখানে যদি হিতচিন্তা না করা যায়, তবে এইরূপ (অপূর্ব) সমাগম পুনরায় কিরূপে সম্ভব হইবে ॥৪॥

---

১ ধর্মকায়—ধর্মকায় সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায়, বুদ্ধের এই ত্রিবিধ কায়ের কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি বুদ্ধের অপরিমেয় গুণ (ধর্ম) সমূহকে তাঁহার "ধর্মকায়" বলা হইয়াছে।

শূন্যবাদীর মতে বুদ্ধের ধর্মকায় কিন্তু উহাতেই সীমাবদ্ধ নহে। উহা একাধারে সগুণ ও গুণাতীত। যখন উহা সগুণ, তখন উহা যাবতীয় সদ্গুণের সমষ্টি। এবং যখন উহা গুণাতীত, তখন উহা ভাব, অভাব, স্বভাব, পরভাব, সত্য, অসত্য, শাশ্বত, উচ্ছেদ, নিত্য, অনিত্য, সুখ, দুঃখ, শুচি, অশুচি, আত্মা, অনাত্মা, শূন্য, অশূন্য, একত্ব, অন্যত্ব, উৎপাদ, নিরোধ ইত্যাদি সর্ব-প্রপঞ্চ-বিনির্মুক্ত। ঐ পরমার্থতত্ত্বই ধর্মকায় নামে পরিচিত। উহাকে প্রজ্ঞাপারমিতা, শূন্যতা, তথতা, ভূতকোটি, ধর্মধাতু প্রভৃতি সংজ্ঞাতেও অভিহিত করা হইয়াছে।

বুদ্ধ বলিয়াছেন—"বুদ্ধগণকে দেহত নহে ধর্মত দেখিতে হইবে। বুদ্ধগণ ধর্মকায়বান।"

বোধিসত্ত্ব বা ভবিষ্যদ্বুদ্ধগণকে (অর্থাৎ বুদ্ধের উত্তরাধিকারিগণকে) সুগতগণের (বা বুদ্ধগণের) সুত বা পুত্র বলা হইয়াছে। বুদ্ধ, ধর্ম, (ধর্মকায় বা ধর্মসমষ্টি) ও সংঘ (অর্থাৎ বোধিসত্ত্বগণ ও অন্য বন্দনীয় জনসংঘ) এই ত্রিরত্নকে প্রণাম করিয়া, গ্রন্থকার গ্রন্থ আরম্ভ করিতেছেন।

২ সাধন-মার্গ—বোধিচিত্ত গ্রহণ এবং বোধিসত্ত্বগণের (শীল, স্মৃতি, জ্ঞান, ক্ষান্তি, বীর্য বিষয়ক) শিক্ষাগ্রহণ-পদ্ধতি। "বোধিচিত্তের" অর্থ, ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। অন্যের হিতসুখের জন্য বুদ্ধত্বাকাঙ্ক্ষাই বোধিচিত্ত। "বোধিচিত্তং পরার্থায় সম্যক্সম্বোধিকামতা।"

৩ ক্ষণসম্পদ—মনুষ্যজন্ম-লাভ দুর্লভ। মনুষ্যজন্ম লাভ হইলেও অন্ধতা, বধিরতা ও মূকতাদি দোষশূন্য ইন্দ্রিয়-লাভ অধিকতর দুর্লভ। তাহাও যদি বা লাভ হয়, বুদ্ধের উৎপত্তি, তাঁহার ধর্ম শ্রবণ এবং তদুপরি শ্রদ্ধোৎপত্তি এবং তদনুযায়ী আচরণ (সেই ধর্মাচরণের আগ্রহ ও শক্তি) প্রথমোক্তগুলি অপেক্ষাও অধিকতর দুর্লভ।

এতাদৃশ সুযোগসমূহের একত্র মিলনকে ক্ষণসম্পদ (ক্ষণ— সুযোগ, সম্পদ—সমগ্রতা, অর্থাৎ সমগ্রসুযোগ, বা সম্পূর্ণ সুযোগ) বলা হইয়াছে।

মেঘাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে যেমন ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎ আলোকদান করে, সেইরূপ বুদ্ধের কৃপায় কদাচিৎ ক্ষণেকের জন্য লোকের পুণ্যে মতি হয়।।৫।।

অতএব শুভ সতত্তই শক্তিহীন এবং পাপ ভয়ংকর শক্তিমান। (সর্বশক্তিমান) সম্বোধিচিত্ত ব্যতীত, আর অন্য কোন্ শুভের দ্বারা সেই (মহাশক্তিমান্) পাপকে জয় করা সম্ভব।।৬।।

কল্প কল্পান্তর ধরিয়া ভাবনা করিয়া, মুনীন্দ্রগণ এই একমাত্র হিত দর্শন করিয়াছেন। কেননা, [ইহাতে প্রথম হইতেই সুখ লাভ হয়। সুখের জন্য দুঃখ সহ্য করিতে হয় না।] ইহাতে সুখ হইতেই সুখ বর্ধিত হইতে থাকে এবং সেই প্রকর্ষগত (বুদ্ধাবস্থার) সুখ, অপরিমেয় জনসংঘকে প্লাবিত করে।।৭।।

যাঁহারা সংসারের অনন্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চান, যাঁহারা জীবের দুঃখশোক দূর করিতে চান, যাঁহারা অনন্ত সুখ ভোগ করিতে চান, তাঁহাদের কখনও এই বোধিচিত্ত পরিত্যাগ করা উচিত নহে।।৮।।

সংসার-বন্ধনাগারে বদ্ধ হতভাগ্য মানব বোধিচিত্ত বরণ করিবামাত্র, সুগতগণের সুতসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এবং তৎক্ষণাৎ সে নরলোক ও দেবলোকের বন্দনীয় হয়।।৯।।

এই অশুচি দেহকে অমূল্য জিন-রত্ন-দেহে পরিণত করে। অতএব এই বোধিচিত্তরূপ অন্তরভেদী (সর্বত্র প্রবেশী) রসৌষধি (স্পর্শমণির ন্যায়, যাহা লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করে) সুদৃঢ় ভাবে গ্রহণ করো।।১০।।

হে (সুখ-সম্পদ্-লাভার্থী) জনগণ, "তোমরা বাণিজ্যকারী বণিক। শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট নানাবিধ কর্মই তোমাদের পণ্য দ্রব্য। এবং উচ্চ নীচ নানাবিধ" গতিই তোমাদের বাণিজ্য-পত্তন। সেই বাণিজ্য-পত্তনে প্রবাসী তোমরা। তোমরা এই বোধিচিত্তকে সুদৃঢ়রূপে গ্রহণ করো। ইহা বহুমূল্য রত্ন। অপরিসীম বুদ্ধিমান, জগতের শ্রেষ্ঠ সার্থবাহগণ (বুদ্ধগণ) ইহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন।।১১।।

অন্য সমস্ত কুশলকর্ম কদলীবৃক্ষের ন্যায়, একবারমাত্র ফলপ্রসব করিয়াই বিনষ্ট হয়। কিন্তু এই বোধিচিত্ত-বৃক্ষ সর্বদা (অবিচ্ছিন্নভাবে সুখসম্পত্তিরূপ) ফল প্রসব করে, কখনও তাহার ক্ষয় হয় না।।১২।।

বীরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেমন মহাভয় দূর হয়, সেইরূপ নিদারুণ পাপ করিয়াও যাহাকে আশ্রয় করিলে মুহূর্তে উদ্ধার পাওয়া যায়, অজ্ঞজীব কেন তাহাকে আশ্রয় করে না।।১৩।।

যে-বোধিচিত্ত, মহাপাপসমূহ, প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট করে, যাহার অপ্রমেয় গুণের বিষয় মৈত্রেয়নাথ বোধিসত্ত্ব সুধনকে বলিয়াছিলেন; সেই বোধিচিত্ত সংক্ষেপে দুই প্রকার: বোধিপ্রণিহিতচিত্ত ও বোধিপ্রস্থানচিত্ত।।১৪-১৫।।

গমন-কামী ও গমন-কারীর মধ্যে যে-ভেদ উপলব্ধ হয়, ইহাদের উভয়ের মধ্যেও সেই ভেদ রহিয়াছে। পণ্ডিতগণ যথাক্রমে ইহাদিগকে সেইভাবেই অবগত হইবেন ॥১৬॥

বোধিপ্রণিহিতচিত্তেরও এই সংসারে বৃহৎ ফল দৃষ্ট হয়। কিন্তু (বোধি-) প্রস্থানচিত্তের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন পুণ্যফল তাহার হয় না ॥১৭॥

মানব যে-মুহূর্তে অনন্ত আকাশব্যাপী জীবজগতের সর্বপ্রকার দুঃখবিমোচনের জন্য, অপরাঙ্মুখচিত্তে বোধিচিত্ত বরণ করেন, সেই মুহূর্ত হইতে, সুপ্ত, প্রমত্ত, সর্বাবস্থাতেই প্রতি ক্ষণে বারংবার আকাশপ্রমাণ অবিচ্ছিন্ন পুণ্যধারা বহিতে থাকে ॥১৮-১৯॥

হীনযানাদিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা, সেই জনগণের জন্য স্বয়ং তথাগত ইহা 'সুবাহুপৃচ্ছা' গ্রন্থে প্রমাণ সহযোগে বলিয়া গিয়াছেন ॥২০॥

"মাত্র কতিপয় ব্যক্তির সামান্য শিরঃপীড়া দূর করিবার ইচ্ছা করিলে, সেই কল্যাণ ইচ্ছার জন্য অপরিমেয় পুণ্য হয়।

"আর প্রত্যেক জীবের অপরিমেয় দুঃখ হরণ করিতে এবং প্রত্যেক জীবকে অপরিমেয় গুণে গুণান্বিত করিতে ইচ্ছা করিলে যে উপরোক্তরূপ পুণ্যধারা বহিতে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী" ॥২১-২২।

কাহার পিতামাতা এইরূপ হিতকামনা করিয়া থাকেন। কোন্‌ দেবতার, কোন্‌ ঋষির, কোন্‌ ব্রাহ্মণের অন্তরে এইরূপ হিতাকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে ॥২৩॥

নিজের জন্যও সেই সব ব্যক্তির অন্তরে কখনও স্বপ্নেও এমন হিতাকাঙ্ক্ষার উদয় হয় নাই, পরের জন্য ইহা সম্ভব হইবে কোথা হইতে ॥২৪॥

এইরূপ অপূর্ব রত্নস্বরূপ জীবের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হয়। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য। কেননা, পরের জন্য তিনি যত চিন্তা করেন, অন্য কোনো ব্যক্তি নিজের জন্যও তত করেন না ॥২৫॥

জগতের সর্বজীবের সর্বপ্রকার আনন্দের হেতু, জগতের সর্বজীবের সর্বপ্রকার দুঃখের ঔষধ, এই (বোধি-) চিত্ত রত্নের যাহা পুণ্য, তাহার পরিমাণ কিরূপে সম্ভব ॥২৬॥

'সর্বজগতের পরিত্রাণের জন্য বুদ্ধ হইব' কেবলমাত্র এই প্রার্থনাই বুদ্ধের পূজাকেও অতিক্রম করে। আর (সর্ব দুঃখ দূর করিয়া) জগতের সর্বজীবকে সর্বসুখে সুখী করিবার চেষ্টায়, যে অপরিমেয় পুণ্য হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী ॥২৭॥

যাহারা দুঃখ হইতে বাহিরে আসিতে গিয়া দুঃখতেই প্রবেশ করিতেছে, সুখের আশায় মোহবশে শত্রুর মতো নিজের সুখকেই নষ্ট করিতেছে ; সেই সব সুখাকাঙ্ক্ষী বহুদুঃখ-পীড়িত দুঃখীদের যিনি সর্বদুঃখ দূর করেন, সর্বসুখে তৃপ্ত করেন, মোহ নষ্ট করেন, তাঁহার মতো

সাধু কোথায়। তাঁহার মতো মিত্রই বা কোথায়। আর তাঁহার পুণ্যের মতো পুণ্যই বা কোথায় ॥২৮-৩০॥

উপকার করিলে যে-ব্যক্তি প্রত্যুপকার করে, তাহাকেই লোকে প্রশংসা করিয়া থাকে। আর অযাচিতভাবে যিনি কল্যাণ করেন, সেই বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে আর কী বলিব ॥৩১॥

নানাপ্রকার অপমান করিয়া, মাত্র ক্ষণকালের জন্য, কতিপয় ব্যক্তিকে, অর্ধদিবস-যাপনোপযোগী সামান্য কদর্য খাদ্য দান করিয়াও সেই অন্নসত্রদাতা পুণ্যকারী বলিয়া গণ্য হয়। আর যিনি আকাশব্যাপী (বা আকাশপ্রমাণ) অসংখ্য অপরিমেয় প্রাণিগণের নির্বাণকাল পর্যন্ত, নিরবধি, সর্বাকাঙ্ক্ষাপূরক অক্ষয়বস্তু দান করেন, তাঁহার বিষয়ে আর কী বলিব ॥ ৩২-৩৩॥

ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন— এইরূপ যজ্ঞপতি (সত্রদাতা) জিনাত্মজের অনিষ্টচিন্তা যে-ব্যক্তি হৃদয়ে পোষণ করে, সেই অনিষ্টচিন্তা যতক্ষণ স্থায়ী হয়, তাহাকে তত কল্প ধরিয়া নরকে বাস করিতে হয়। আর যে-ব্যক্তির মন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়, তাহার ঐ পূর্বপরিমাণ পাপ অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ পুণ্য হয়। তাঁহার অকল্যাণ করিতে বহুশক্তির প্রয়োজন, কিন্তু তাঁহার কল্যাণ অনায়াসেই করা যায় ॥৩৪-৩৫॥

পরম রত্নস্বরূপ এইরূপ চিত্ত যে শরীরে উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহাদের সেই শরীরকে আমি প্রণাম করিতেছি। অপকার করিলেও যাঁহারা আনন্দ দিয়া থাকেন, সেই আনন্দের আকর বোধিসত্ত্বদের শরণ লইতেছি ॥৩৬॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই চিত্ত-রত্ন গ্রহণের জন্য, তথাগত, নির্মল সদ্ধর্ম-রত্ন এবং গুণের সাগর বোধিসত্ত্বদের সম্যক্‌ভাবে পূজা করিতেছি ॥১॥

এই জগতে যতপ্রকার ফল ও পুষ্প আছে, যতপ্রকার ঔষধী আছে, যতপ্রকার রত্ন আছে, এবং যতপ্রকার স্বচ্ছ মনোজ্ঞ পানীয় রহিয়াছে, যত রত্নময় পর্বত, যত বিবেকানুকূল বনপ্রদেশ, যত সুন্দর পুষ্পাভরণোজ্জ্বল লতা, শ্রেষ্ঠফলাবনতশাখা বৃক্ষ, দেবগন্ধর্বাদি লোকে যত-প্রকার গন্ধদ্রব্য, যত রত্নময় বৃক্ষ ও কল্পদ্রুম, যত কমলশোভিতা, হংসকূজনমুখরিতা, অতি মনোহারিণী পুষ্করিণী, অকৃষিজাত যতপ্রকার শস্যাদি, আরাধ্য ব্যক্তিগণের জন্য যতপ্রকার শোভাবর্ধনকারী সামগ্রী ; গগনব্যাপী যত অপরিগৃহীত বস্তু, সেই সমস্তই মনে মনে আহরণ করিয়া, সপুত্র মুনিপুঙ্গবগণকে প্রদান করিতেছি। পরমদক্ষিণার্হ মহাকারুণিকগণ (দীনহীন) আমার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক তাহা গ্রহণ করুন ॥২-৬॥

আমি কোনো পুণ্যই করি নাই। আমি অত্যন্ত দরিদ্র। পূজার জন্য (কাল্পনিক ভিন্ন বাস্তব) অন্য কিছুই আমার নাই। অতএব পরহিতব্রতী নাথ, আমার কল্যাণের জন্য নিজ শক্তিতে ইহা গ্রহণ করুন ॥৭॥

আমি জিনগণকে আত্মদান করিতেছি। তাঁহাদের আত্মজ বোধিসত্ত্বদিগকেও সর্ব-প্রকারে সর্বস্ব প্রদান করিতেছি। হে নরোত্তমগণ, আমাকে গ্রহণ করো। আমি পরম শ্রদ্ধার সহিত তোমাদের দাসত্ব স্বীকার করিতেছি ॥৮॥

তোমরা আমাকে আশ্রয় দান করিলে, আমি নির্ভীক হইয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিব। পূর্বের পাপসমূহকে অতিক্রম করিব। এবং পুনর্বার অন্য কোনো পাপ করিব না ॥৯॥

রত্নময় স্তম্ভ, মুক্তাময় ভাস্বর বিতান ও স্বচ্ছ-উজ্জ্বল-স্ফটিক-কুট্টিম-সমন্বিত, সুবাসিত মনোরম স্নানগৃহে ; মনোজ্ঞ সুগন্ধি পুষ্প ও উদকপূর্ণ মহারত্নময় শত শত কলসের দ্বারা, তথাগত এবং তদাত্মজ বোধিসত্ত্বদিগকে গীত বাদ্য সহ স্নান করাইতেছি ॥১০-১১॥

ধূপগন্ধযুত, ধৌত, নির্মল, নিরুপম বস্ত্রের দ্বারা, তাঁহাদের শরীর মার্জন করিতেছি। অতঃপর সুরক্ত ও সুগন্ধি উত্তম চীবর তাঁহাদিগকে দান করিতেছি ॥১২॥

সূক্ষ্ম সুকোমল বিচিত্র-বর্ণ-শোভি দিব্য বস্ত্র, এবং (মুকুট, কটক, কেয়ূর, হার নূপুরাদি) উৎকৃষ্ট অলংকারের দ্বারা, সমন্তভদ্র, অজিত, মঞ্জুঘোষ, লোকেশ্বর প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণকে বিভূষিত করিতেছি ॥১৩॥

মুনীন্দ্রগণের সুতপ্ত (অনল-পরিশোধিত)-সুমার্জিত-সুধৌত-সুবর্ণ-কান্তিসম উজ্জ্বল দেহে, অনন্ত-বিশ্বপ্রসারি-সুবাস-সমন্বিত উত্তম গন্ধদ্রব্য লেপন করিতেছি ॥১৪॥

মান্দার ইন্দীবর ও মল্লিকাদি সর্বপ্রকার সুগন্ধি মনোরম পুষ্পের এবং সুগ্রথিত মনোহর মাল্যের দ্বারা পরমপূজ্য মুনীন্দ্রগণের পূজা করিয়া, স্ফীত দিগন্তব্যাপী (বহু-গন্ধ-বাহী) ধূপ-মেঘের দ্বারা তাঁহাদিগকে ধূপান্বিত করিতেছি। খাদ্য, ভোজ্য এবং বিবিধ পানীয় সামগ্রীর নৈবেদ্য তাঁহাদিগকে নিবেদন করিতেছি ॥১৫-১৬॥

স্বর্ণ-পদ্মের উপর স্থাপিত রত্ন-প্রদীপমালা নিবেদন করিতেছি। এবং গন্ধোপলিপ্ত কুট্টিমে মনোহরভাবে পুষ্পবর্ষণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

লম্বমান মুক্তা ও মণিহার-শোভিত, প্রভাস্বর, দিগ্-মুখমণ্ডনকারী, স্তুতিগানরমণীয় বিমান (মন্দির) সমূহ, মৈত্রীময় বুদ্ধবোধিসত্ত্বদিগকে নিবেদন করিতেছি ॥১৮॥

কমনীয়, কনকদণ্ডি, মুক্তাখচিত, পরমশোভনীয়, ঊর্ধ্বোত্তোলিত রত্নাতপত্র মহামুনিদের মস্তকে ধারণ করিতেছি ॥১৯॥

অতঃপর চিত্তাকর্ষক পূজারাশি (মন্তিন্ন অন্য দেবতাদি কর্তৃক উপনীত) এবং সর্বজীবের আনন্দদায়ক তূর্যানুগত অপর্যাপ্ত ঐক্যতান সংগীত (কল্প বা কল্পান্ত কালের জন্য) প্রকর্ষরূপে প্রবর্তিত হউক ॥২০॥

সদ্ধর্ম-রত্ন, চৈত্য এবং প্রতিমাসমূহে, পুষ্প, রত্ন, ও চন্দনাদিবর্ষণ নিরন্তর প্রবাহিত হউক ॥২১॥

মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি (বোধিসত্ত্বগণ) যে-ভাবে জিনগণের পূজা করেন, সেইভাবে (সেইরূপ শ্রদ্ধাসহকারে) পুত্রগণ সহ তথাগত নাথগণের পূজা করিতেছি ॥২২॥

রাগাম্বুধিযুক্ত স্তোত্রের দ্বারা, আমি গুণাম্বুধিদের স্তুতি করিতেছি। আমার কল্পনানুরূপ স্তুতিগীতসমূহ উৎপন্ন হউক ॥২৩॥

ধর্ম ও বোধিসত্ত্বগণ সহ, অতীত অনাগত এবং বর্তমান বুদ্ধগণকে, সর্ববুদ্ধক্ষেত্রে যত পরমাণু আছে, ততবার প্রণাম করিতেছি ॥২৪॥

সর্ব চৈত্যের এবং বোধিসত্ত্বগণের আশ্রয়সমূহের বন্দনা করিতেছি। উপাধ্যায় এবং বন্দনীয় যতিগণকে প্রণাম করিতেছি ॥২৫॥

বোধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত, বুদ্ধের শরণ লইতেছি, ধর্মের শরণ লইতেছি এবং বোধিসত্ত্বগণের শরণ লইতেছি ॥২৬॥

এই জন্মে কিংবা জন্মজন্মান্তরে মূঢ় আমি (স্বয়ং) যে-পাপ করিয়াছি বা (অন্যকে দিয়া) করাইয়াছি, মোহবশত আত্মবিনাশের জন্য যে-পাপের অনুমোদন করিয়াছি, অনুতাপে অনুতপ্ত হইয়া সর্বদিকে অবস্থিত মহাকারুণিক সম্বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে আজ সেই সমস্তই প্রকাশ করিতেছি ॥২৭-২৯॥

গর্ববশত, কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা, রত্নত্রয়ের, মাতাপিতার বা অন্যান্য গুরুজনের

যে-অপকার করিয়াছি, পাপী আমি (কাম-ক্রোধাদি) বহু দোষে দুষ্ট হইয়া যে নিদারুণ পাপ করিয়াছি, হে নায়কগণ, সেই সমস্তই প্রকাশ করিতেছি ॥৩০-৩১॥

হায়, কেমন করিয়া ইহা হইতে নির্গত হইব। সত্বর আমাকে পরিত্রাণ করো। আমার পাপ ক্ষয় হইতে না হইতেই যেন আমার মৃত্যু না হয় ॥৩৩॥[১]

কী করা হইল, কী করা হইল না বাকি রহিল, মৃত্যু ইহা পরীক্ষা করে না। সে বিশ্বাসঘাতক। সুস্থ এবং অসুস্থ কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। সে আকস্মিক মহাবজ্রসদৃশ, সহসা যাহার তাহার উপর আসিয়া পড়ে ॥৩৪॥

প্রিয়জন এবং অপ্রিয় ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, আমি নানারূপ পাপ করিয়াছি। মূঢ় আমি ভাবি নাই যে, এই প্রিয় এবং অপ্রিয় জনগণের সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া আমায় চলিয়া যাইতে হইবে ॥৩৫॥

স্বপ্নে অনুভূত বিষয় যেমন চিরকালের মতো চলিয়া যায়, আর তাহাদের দেখা পাওয়া যায় না, সেইরূপ (প্রিয় বা অপ্রিয়) যে-কোনো বস্তুই অনুভব করি, ভবিষ্যতে সে-সমস্তই স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হয় ॥৩৭॥[২]

এইখানেই থাকিতে থাকিতে, দেখিতে দেখিতে, বহু প্রিয়জন এবং অনেক অপ্রিয় ব্যক্তি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের জন্য (বা তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া) যে-পাপ করিয়াছি, সেই ঘোর পাপ আমার সম্মুখেই রহিয়াছে ॥৩৮॥

"আমি এখানে কাহারও পরিচিত নহি এবং আমারও কেহ পরিচিত নহে," আমি আগন্তুক মাত্র, এই কথা কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। হায়, মোহ, স্নেহ ও বিদ্বেষবশত নানাপ্রকার পাপ করিয়াছি ॥৩৯॥

রাত্রিদিন অবিশ্রাম আয়ুর ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে। কিছুমাত্র আয় হইতেছে না। আমার কি মৃত্যু হইবে না ॥৪০॥

এই সংসারের মধ্যে বন্ধুগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়াও শয্যাগত অবস্থায় মর্মচ্ছেদাদি সমস্ত বেদনা একা আমাকেই সহ্য করিতে হইবে ॥৪১॥

যখন যমদূতগণের দ্বারা আক্রান্ত হইব, তখন সুহৃদ বন্ধু সব কোথায় থাকিবে। একমাত্র পুণ্যই আমার পরিত্রাণের উপায় ; অথচ সেই পুণ্যই আমি উপার্জন করি নাই ॥৪২॥

হে নাথ, অনিত্য জীবনের প্রতি আসক্তিবশত এই ভয়ের কথা না জানিয়া মদগর্বিত হইয়া আমি বহু পাপ সঞ্চয় করিয়াছি ॥৪৩॥

১ ৩২ শ্লোক সব পুঁথিতে পাওয়া যায় না। তিব্বতী অনুবাদেও উহা নাই। সেইজন্য প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া উহার অনুবাদ বাদ দেওয়া হইল।

২ ৩৬ শ্লোক ভাষ্যকার ধরেন নাই। সম্ভবত উহাও প্রক্ষিপ্ত।

অপরাধী ব্যক্তিকে যখন সামান্য কোনো এক অঙ্গচ্ছেদের জন্য লইয়া যাওয়া হয়, তখনই তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইতে থাকে, সে পিপাসিত দীনদৃষ্টি হইয়া সমস্ত জগৎকে বিপরীত দেখিয়া থাকে। আর যখন ভীমাকৃতি যমদূতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত, মহাত্রাস-জ্বরগ্রস্ত, পুরীষলিপ্তাঙ্গ আমি কাতরদৃষ্টিতে চতুর্দিকে পরিত্রাণ অন্বেষণ করিব, তখন সেই মহা বিভীষিকার মধ্যে কোন্ সাধু আমার পরিত্রাতা হইবেন।

কোনো দিকেই যখন ত্রাণের উপায় দেখিতে পাইব না, তখন আবার আমার মূর্চ্ছা হইবে। সেই মহাভয়ের মধ্যে, সেই স্থানে আমি কী করিব ॥৪৪-৪৭॥

সর্বত্রাসহারী মহাশক্তিমান্ জগৎরক্ষায় উদ্যত জগন্নাথ জিনগণের আমি আজই শরণ লইতেছি ॥৪৮॥

সেই ভগবান বুদ্ধগণ সংসারের ভয়নাশন ধর্মের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন। (স্বেচ্ছায়) পরমপ্রসন্নতার সহিত আমি সেই ধর্মের এবং বোধিসত্ত্বদের শরণ লইতেছি ॥৪৯॥

ভয়বিহ্বল আমি সমন্তভদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি; এবং মঞ্জুঘোষকে স্বেচ্ছায় আত্মদান করিতেছি ॥৫০॥

প্রাণ যাঁহার করুণায় ব্যাকুল সেই নাথ অবলোকিতেশ্বরকে ভীত আমি আর্তস্বরে আহ্বান করিতেছি। এই পাপীকে তিনি রক্ষা করুন ॥৫১॥

আর্য আকাশগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ[১] এবং অন্য সমস্ত মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বগণকে, ত্রাণান্বেষী হইয়া, আমি আহ্বান করিতেছি ॥৫২॥

যাঁহাকে দেখিবামাত্র যমদূতাদি সমস্ত দুষ্ট ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করে, সেই বজ্রীকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥৫৩॥

তোমাদের আদেশ অতিক্রম করিয়াছিলাম, এখন ভয় পাইয়া ভীত হইয়া, তোমাদেরই শরণ লইতেছি। শীঘ্র ভয় দূর করো ॥৫৪॥

যাহার আরোগ্য সম্ভব, যাহা অচিরস্থায়ী সেই (সামান্য) ব্যাধি দেখিয়াও ভীত হইয়া লোকে বৈদ্যবাক্য লঙ্ঘন করে না। চতুরধিক চতুঃশত (অসাধ্য) ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি কি তাহা লঙ্ঘন করিবে ॥৫৫॥

দেখো, এই সমস্ত ব্যাধির মধ্যে এমন ব্যাধিও আছে, জগতের কোনো দিকেই যাহাদের ঔষধ মিলে না। যাহার একটি ব্যাধিতেই জম্বুদ্বীপের যাবতীয় মানুষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ॥৫৬॥

এরূপ অবস্থায় আমি কিনা সর্বশল্যাপহারী সর্বজ্ঞ বৈদ্যের বাক্য লঙ্ঘন করিতেছি। আমি অত্যন্ত মূঢ়, আমাকে ধিক্ ॥৫৭॥

---

১ আকাশগর্ভ ও ক্ষিতিগর্ভ দুইজন পৌরাণিক বোধিসত্ত্বের নাম।

অতি সামান্য প্রপাতস্থলেও আমরা অতি সাবধানে অবস্থান করি। আর সহস্র-যোজন এবং দীর্ঘকালিক (নরক-) প্রপাতের বিষয়ে আর কথা কী ॥৫৮॥

'আজই তো আমার মরণ হইতেছে না,' এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। একদিন আমার অবসান-বেলা অবশ্যই আসিবে ॥৫৯॥

কে আমাকে অভয় দিয়াছে। কেমন করিয়া মুক্ত হইব। নিশ্চয়ই একদিন আমার দিন ফুরাইবে। আমার মন কেমন করিয়া সুস্থির রহিয়াছে ॥৬০॥

পূর্বে যাহা কিছু ভোগ করিয়াছিলাম, সে-সমস্তই তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; তাহা হইতে আজ কী সার বস্তু অবশিষ্ট রহিয়াছে, যাহার আসক্তিতে আমি আমার গুরু (বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব) গণের বাক্য লঙ্ঘন করিয়াছি ॥৬১॥

এই জীবলোক এবং পরিচিত বন্ধু বান্ধব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, একাকী কোথায় "কোন্ অজ্ঞাতস্থানে" চলিয়া যাইব। আমার "আত্মীয় অনাত্মীয়" প্রিয়, অপ্রিয়ের দ্বারা হইবে কী

অশুভ কর্মের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ হইতে কেমন করিয়া বাহির হইব— রাত্রিদিন সর্বক্ষণ এখন আমার এই একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত ॥৬৩॥

অজ্ঞান আমি, মূঢ় আমি, মোহমুগ্ধ হইয়া হত্যাদি (প্রকৃতি-অবদ্য) এবং আচার-লঙ্ঘনাদি (প্রজ্ঞপ্তি-অবদ্য) যে-সমস্ত পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, দুঃখে ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে, সেই সমস্তই আমি আমার প্রভুদের সম্মুখস্থ হইয়া প্রকাশ করিতেছি। "কিছুমাত্র গোপন করিতেছি না।" এই সমস্ত অশুভ কর্মকে তাঁহারা অশুভ কর্মরূপেই দেখুন।

হে নাথ, পুনর্বার (কদাচ) আমি আর এই অশুভ কর্ম করিব না ॥৬৪-৬৬॥
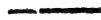
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবগণ (বহুকাল) নরকদুঃখ ভোগ করিয়া স্বকৃত শুভ কর্মের ফলস্বরূপ (কিছুক্ষণ) সুখী হইয়া বিশ্রাম করিতেছে। তাহাদের সেই আনন্দে আমি (কায়মনোবাক্যে) আনন্দিত হইতেছি। "তাহারা বেশ ভালো কাজ করিয়াছে।" আহা, দুঃখীরা সুখে থাকুক ॥১॥

প্রাণিগণের সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তিতে আমার আনন্দ হইতেছে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের বুদ্ধত্ব এবং বোধিসত্ত্বতা প্রাপ্তিতে আমার আনন্দ হইতেছে ॥২॥

শাসক বোধিসত্ত্বগণের সর্বজীবের সুখবাহী সর্বজীবের হিতসাধনকারী, অগাধ-সমুদ্রোপমচিত্তোৎপত্তিতে আমার আনন্দ হইতেছে ॥৩॥

"অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন" জীবগণ মোহবশত "দিশা হারা হইয়া" দুঃখ-প্রপাতের মধ্যে পতিত হইতেছে। সর্বদিকের সর্ববুদ্ধের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা ইহাদের জন্য ধর্ম-প্রদীপ প্রজ্জলিত করুন ॥৪॥

নির্বাণকামী জিনগণের নিকট আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া যাচনা করিতেছি, তাঁহারা যেন অনন্ত কল্প ধরিয়া এই জগতে অবস্থান করেন। জগৎ যেন মোহে অন্ধ না হয় ॥৫॥

এইরূপে "বুদ্ধাদির পূজা করিয়া, নিজের পাপ তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া ও পুণ্যের অনুমোদন করিয়া", যে-পুণ্য অর্জন করিলাম, তাহার দ্বারা যেন আমি সর্বজীবের, সর্বদুঃখের উপশম করিতে পারি ॥৬॥

আতুর যাহারা, রোগী যাহারা, আমি যেন তাহাদের ঔষধ, আমি যেন তাহাদের বৈদ্য হইতে পারি। রোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি যেন তাহাদের পরিচারক হই ॥৭॥

অন্ন ও পানীয় বর্ষণের দ্বারা, আমি যেন ক্ষুৎপিপাসার ব্যথা দূর করিতে পারি। অন্তর কল্পের দুর্ভিক্ষের সময়, আমিই যেন সকলের পানীয় ও খাদ্য হই ॥৮॥

ধনহীন দীনজনের যেন আমি অক্ষয় ধনভাণ্ডার হই। নানা উপকরণরূপে যেন আমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকি ॥৯॥

সর্বজীবের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার সর্বজন্মের সর্বদেহ, সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু, অতীত অনাগত ও বর্তমান সর্বকালের কুশলকর্ম, আমি নিরাসক্ত হইয়া ত্যাগ করিতেছি ॥১০॥

নির্বাণ লাভ করিতে হইলে সমস্ত ত্যাগ করিতে হয়। আমার মন নির্বাণকামী। অতএব সমস্তই যখন আমায় ত্যাগ করিতে হইবে তখন তাহা প্রাণিগণকে দান করাই শ্রেয় ॥১১॥

সর্বজীবের যথেচ্ছ সুখলাভের জন্য আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিন্দা করুক, সতত ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক; ক্রীড়া, হাস্য, বিলাসাদি তাহাদের সুখকর যে-কোনো কার্য তাহারা করুক, তাহাদিগকেই এই দেহ সমর্পণ করিয়াছি। ইহার চিন্তায় আর আমার প্রয়োজন কী।

আমাকে অবলম্বন করিয়া যেন কদাচ কাহারও অনর্থ না হয় ॥১২-১৪॥

আমাকে অবলম্বন করিয়া যাহাদের চিত্ত রুষ্ট বা অপ্রসন্ন হয়, তাহাদের সেই রুষ্টতা ও অপ্রসন্নতাই যেন সর্বদা সর্ব অর্থসিদ্ধির (অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের) কারণ হয় ॥১৫॥

যাহারা আমাকে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবে, যাহারা আমার (শারীরিক ও মানসিক) অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে; তাহারা এবং অবশিষ্ট অন্য সকলেও যেন বুদ্ধত্ব লাভ করে ॥১৬॥

আমি অনাথের নাথ, পথিকগণের পথপ্রদর্শক, এবং নদনদী উত্তরণকামীদের নৌকা, সেতু ও সংক্রম ॥১৭॥

আমি যেন দীপাকাঙ্ক্ষীর দীপ, শয্যাভিলাষীর শয্যা, এবং দাসার্থির দাস হইতে পারি ॥১৮॥

আমি যেন সর্বজীবের চিন্তামণি, ভদ্রঘট, সিদ্ধবিদ্যা, মহৌষধি, কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনু হইতে পারি ॥১৯॥

ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতগণ যেমন অনন্ত-আকাশব্যাপী অপরিমেয় জীবগণের নানারূপ ভোগের উপাদান হয়, আমিও যেন তেমনি সেই গগনব্যাপী প্রাণিগণের নানারূপ ভোগের উপাদান হইতে পারি।

যতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীব নির্বাণ লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত আমি যেন এইভাবে নানারূপে তাহাদের উপজীব্য হই ॥২০-২১॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার এই চিত্তস্থ ক্লেশরিপু (কাম, ক্রোধ, মোহাদি) নির্বাসিত হইয়া কোথায় যাইতে পারে। কোথায় থাকিয়া সে আমার বধের চেষ্টা করিতে পারে। কই, তেমন কোনো স্থান তো আমি দেখিতেছি না। ইহারা অলীক। উদ্যমের দ্বারা প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করিলেই ইহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হায়, মন্দবুদ্ধি আমার উদ্যম নাই ॥৪৬॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই বিষয় সমূহের মধ্যে কাম-ক্রোধাদি (ক্লেশ) নাই। "যদি এই বিষয় সমূহে কামাদি থাকিত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়-সংযোগে সকলের মনেই কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি হইত। কিন্তু তাহা তো হয় না। এমন অনেক বীতরাগ ব্যক্তি আছেন, (ইন্দ্রিয়ের সহিত) বিষয়-সংযোগেও যাঁহাদের মনে কামাদি উৎপন্ন হয় না।"

এইরূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও কামাদি নাই। "কারণ, ধর্মচিন্তার সময় ইন্দ্রিয় বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কাম-ক্রোধাদির উপলব্ধি হয় না।" ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অন্তরালবর্তী কোনো স্থানেও ইহারা নাই। অথচ ইহারা সমস্ত জগৎকে মন্থন করিতেছে।

ইহারা মায়ামাত্র। অতএব হে মন, ভয় পরিত্যাগ করো। তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত উদ্যোগ করো। অনর্থক কেন কামক্রোধাদির অধীন হইয়া নিজেকে নরকে কষ্ট দিতেছ ॥৪৭॥

এইরূপ স্থির করিয়া, শাস্ত্রোক্ত শিক্ষালাভের জন্য প্রযত্ন করিব। বৈদ্যের উপদেশ হইতে বিচ্যুত হইলে ঔষধ-সাধ্য রোগীর নিরাময়ত্ব কোথায় ॥৪৮॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিষয়ের" শিক্ষা পালন করিতে হইলে, চিত্তকে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করা প্রয়োজন। চঞ্চল চিত্তকে রক্ষা না করিলে শিক্ষা পালন করা যায় না ॥১॥

"সংযমবন্ধন"-মুক্ত চিত্ত-মাতঙ্গ পরলোকে নরকাদিতে যেরূপ পীড়া দেয়, ইহলোকে অদান্ত মত্তমাতঙ্গও ততদূর পীড়া দেয় না ॥২॥

চিত্ত-মাতঙ্গ স্মৃতি-রজ্জুর[১] দ্বারা সম্পূর্ণ বদ্ধ হইলে, সমস্ত ভয় দূরে যায় এবং সমস্ত কল্যাণ (অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্) লাভ করা যায় ॥৩॥

সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, ভল্লুক, সর্প, সর্বপ্রকার শত্রু, সর্ব নরক-পাল, ডাকিনী ও রাক্ষসগণ, ইহারা সকলেই একমাত্র চিত্তের বন্ধনেই বদ্ধ হয় এবং একমাত্র চিত্তের দমনেই দান্ত হয় ॥৪-৫॥

কারণ, তত্ত্ববাদী (বুদ্ধ) বলিয়াছেন,—সর্বপ্রকার ভয়, এবং অপরিমেয় দুঃখ, একমাত্র চিত্ত হইতেই উৎপন্ন হয় ॥৬॥

নরকে "নরক-পালগণের" অস্ত্র-সমূহ "কিংবা অসিপত্রের অরণ্যাদি" কে সৃষ্টি করিয়াছে। তপ্ত লৌহময় ভূমিই বা কে নির্মাণ করিয়াছে। "পরদারিকেরা যে-সমস্ত স্ত্রীলোক দর্শন করে" সেই স্ত্রীলোকগণই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ॥৭॥

(শাক্য-) মুনি বলিয়াছেন যে, সমস্তই পাপচিত্ত হইতে সমুদ্ভূত। অতএব ত্রিলোকে চিত্ত ভিন্ন ভয়ানক (ভয়ের হেতু) আর কিছু নাই ॥৮॥

যদি জগতের (সর্বপ্রকার) দারিদ্র্য নষ্ট করিলে 'দানপারমিতা' সিদ্ধ হয়, তবে পূর্ব বুদ্ধ (তায়ি-) গণের 'দানপারমিতা' কোথা হইতে সম্ভব হইল। জগৎ তো অদ্যাবধি দরিদ্রই রহিয়া গিয়াছে ॥৯॥

চিত্ত হইতে সর্বস্ব (সর্ব কাম্যবস্তু) সর্বজনের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের যে-ফল (স্বর্গাদি) তাহাও সর্বজনকে দান করিতে হইবে। "এইরূপ ক্রমাগত ত্যাগ অভ্যাসের দ্বারা যে-মাৎসর্য-বিহীন, নির্মল, নিরাসক্ত চিত্ত উৎপন্ন হয়", তাহাই 'দানপারমিতা' বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং চিত্তই (অর্থাৎ চিত্তের অবস্থাবিশেষই) 'দানপারমিতা' ॥১০॥

"বধ্য না থাকিলে অবশ্য বধ সম্ভব হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া বধ্য" মৎস্যদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে, যাহাতে আর তাহাদিগকে বধ করা সম্ভব হইবে না। "বধ্য হইতে চিত্ত বিরত হওয়াই প্রয়োজন।" এইরূপ চিত্ত-বিরতি লাভ করিলেই 'শীলপারমিতা' সিদ্ধ হয় ॥১১॥

আকাশ-প্রমাণ অসংখ্য দুর্জন ব্যক্তির কতজনেরই বা আমি প্রাণ সংহার করিতে পারি। (একমাত্র) ক্রুদ্ধচিত্তকে হত্যা করিলেই সর্বশত্রু নিহত হয় ॥১২॥

১ বিহিত এবং প্রতিষিদ্ধ বিষয়ের যথাযথ স্মরণের নাম 'স্মৃতি'।

সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদন করিবার মতো চর্ম কোথা হইতে পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র উপানৎ-চর্মের দ্বারাই (সমস্ত) পৃথিবী আচ্ছাদিত হইয়া যায় ॥১৩॥

সেইরূপ (শত্রুপ্রভৃতি) বাহ্য বস্তুসমূহকে নিবারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমার নিজের চিত্তকেই আমি বারণ করিব। আমার অন্যকে বারণ করিবার কী প্রয়োজন ॥১৪॥

চিত্ত যদি (কুশলবিষয়ে) মন্থরগতি, অপটু হয়, তাহা হইলে বাক্য এবং দেহ উভয়ের সহযোগেও সেই ফল হয় না, যাহা একক পটু চিত্তের দ্বারা সম্ভব হয়। একক হইলেও (ধ্যানাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত) ঐ পটু চিত্তেরই ব্রহ্মত্বাদি ফল প্রাপ্তি হয় ॥১৫॥

সর্বজ্ঞ ভগবান বলিয়াছেন—চিত্ত যদি জড় এবং অন্যত্র আসক্ত থাকে, তাহা হইলে (মন্ত্রাদি) জপ এবং (কায়-ক্লেশকর) তপ দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে থাকিলেও, তাহার কোনই ফল হয় না ॥১৬॥

যাঁহারা সর্বধর্মের নিদানস্বরূপ এই গুহ্য (অর্থাৎ যাহার প্রকৃতি অজ্ঞব্যক্তিগণের অগোচর) চিত্তকে তত্ত্বচিন্তার দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্থির (নিশ্চল) না করেন, তাঁহারা দুঃখবিনাশ, ও সুখলাভের জন্য বৃথাই শূন্যে (আকাশে) ভ্রমণ করেন ॥১৭॥

অতএব সু-অধিষ্ঠিত চিত্তকে আমার সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। চিত্তরক্ষা-ব্রত পরিত্যাগ করিয়া আমার অন্যবিধ ব্রতের দ্বারা কী হইবে ॥১৮॥

চঞ্চল জনতার মধ্যে যেমন কোনো ব্রণধারী ব্যক্তি তাহার ব্রণ সতর্কতার সহিত রক্ষা করে, দুর্জনগণের মধ্যে চিত্ত-ব্রণকেও সেইরূপ সতর্কতার সহিত সর্বদা রক্ষা করা উচিত ॥১৯॥

ব্রণে আঘাত লাগিলে যে-দুঃখ তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাহার ভয়েই আমি তৎপরতার সহিত ব্রণ রক্ষা করি। আর "নারকীয় বহু-সহস্র-বর্ষ ব্যাপী প্রচণ্ড" পর্বত-সংঘাতের ভয়েও আমি কি চিত্ত-ব্রণ রক্ষা করিব না ॥২০॥

এইরূপ মনোভাব লইয়া দুর্জনগণের মধ্যে, অথবা বনিতাদিগের মধ্যে বিচরণ করিলেও, ধীর যতি ব্যক্তির স্খলন হয় না ॥২১॥

আমার লাভ, সম্মান, দেহ, প্রাণ, এবং যাহা কিছু কুশলকর্ম সমস্তই নষ্ট হউক, কিন্তু আমার চিত্ত যেন কদাচ নষ্ট না হয় ॥২২॥

যাঁহারা চিত্তকে রক্ষা করিতে চান, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা সর্ব-প্রযত্নে 'স্মৃতি' এবং 'সংপ্রজন্যকে'[১] রক্ষা করুন ॥২৩॥

১ যখন যে-অবস্থায় থাকা যায়, যে-কার্য বা চিন্তা করা যায়, তখন সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকার নাম 'সংপ্রজন্য'।

ব্যাধির দ্বারা শক্তিহীন ব্যক্তি যেমন সর্বকার্যে অক্ষম হয়, 'স্মৃতি-সংপ্রজন্য'-হীন বিকলচিত্তও সেইরূপ (ধ্যান-ধারণাদি) সর্বকর্মে অক্ষম হয় ॥২৪॥

সছিদ্র কলসের মধ্যে যেমন জল থাকে না, যে-ব্যক্তির চিত্তে 'সংপ্রজন্য' নাই, তাহার স্মৃতি-মধ্যেও সেইরূপ 'শ্রুত, চিন্তা, ভাবনা' (-রূপ প্রজ্ঞা) অবস্থান করে না ॥২৫॥

বহুশ্রুত, (শিক্ষায়) শ্রদ্ধাবান ও প্রযত্নশীল হইয়াও অনেকে অসতর্কতা (অসংপ্রজন্য)-দোষবশত, পাপের দ্বারা কলুষিত হন ॥২৬॥

মানুষ, পুণ্য সঞ্চয় করিয়াও, প্রহরীস্বরূপ 'স্মৃতির' অভাবে, অনুসরণকারী 'অসংপ্রজন্য'-চোর কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া নরকে (বা নীচযোনিতে) গমন করে ॥২৭॥

কাম, ক্রোধ, দ্বেষ ও মোহাদি (ক্লেশ)-তস্কর-সংঘ (প্রবেশ-) মার্গ অন্বেষণ করিতেছে। তাহা লাভ করিলেই উহারা (কুশলসম্পত্তি) লুণ্ঠন করিতে থাকে এবং সদ্গতির (উত্তম জন্মাদির) উপায় নষ্ট করে ॥২৮॥

অতএব 'স্মৃতি' যেন মনোদ্বার হইতে কদাচ অপনীত না হয়। কদাচিৎ অপনীত হইলে, নরকাদি-দুর্গতির দুঃখ স্মরণপূর্বক তাহাকে পুনর্বার সেখানে স্থাপন করিবে ॥২৯॥

আচার্য ও উপাধ্যায়াদি গুরুর নিকট বাস করিতে করিতে, তাঁহাদের অনুশাসন-ভয়ে, (ভীত, অথচ) শ্রদ্ধাকারী সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিদের সহজেই 'স্মৃতি' উৎপন্ন হয় ॥৩০॥

বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণ সর্বত্র অপ্রতিহত-দৃষ্টি। সমস্ত বস্তুই তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। আমি তাঁহাদের সম্মুখে রহিয়াছি। এইকথা মনে করিয়া, লজ্জা, ভয় এবং শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া, যথাযোগ্যভাবে অবস্থান করিবে। যে এইরূপ করে, তাহার সর্বদা বুদ্ধানুস্মৃতি হয় ॥৩১-৩২॥

'স্মৃতি' যখন মনোদ্বারে রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত (প্রহরীর ন্যায়) অবস্থান করিবে, তখন 'সংপ্রজন্য' আসিবে, এবং আসিয়া আর চলিয়া যাইবে না ॥৩৩॥

(অধ্যাত্মচিন্তা বা ধ্যানের সময়) প্রথমে, এই চিত্তকে সতত এইরূপে (সুপ্রতিষ্ঠিত) রাখিতে হইবে। তাহার পর ইন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্যের ন্যায় সর্বদা কাষ্ঠবৎ অবস্থান করিতে হইবে ॥৩৪॥

অনর্থক দৃষ্টিবিক্ষেপ কদাচ করিবে না। স্থিরচিত্তে দৃষ্টিকে সর্বদা অধোগামী রাখিবে[১] ॥৩৫॥

(প্রথমাবস্থায়) দৃষ্টির বিশ্রামহেতু (অর্থাৎ দৃষ্টি ও চিত্তের খেদ দূরীকরণের জন্য) কখনো কখনো চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। কাহারও ছায়ামাত্র দৃষ্টিগোচর হইলে, অভ্যর্থনার জন্য (অভ্যর্থনার দ্বারা তাহার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য) তাহাকে বিশেষরূপে দর্শন করিবে ॥৩৬॥

১ পক্ষ্মযুগল ঈষৎ মুকুলিত ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবেশিত করিয়া সম্মুখে যুগমাত্র (গরুর গাড়ীর জোয়ালের পরিমাণ স্থান) দর্শন করিবে।

মার্গাদিতে কোনোদিক হইতে কোনো ভয়ের আশঙ্কা আছে কিনা, জানিবার জন্য, ক্ষণকাল (ক্রমান্বয়ে) চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। সেই সময় (মুহূর্তের জন্য) ভ্রমণ বন্ধ রাখিবে। পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাতের জন্য পশ্চাদ্ ফিরিবে ॥৩৭॥

সম্মুখে এবং পশ্চাতে, সম্যক্ পর্যবেক্ষণ করিয়া অগ্রসর হইবে বা অপসরণ করিবে। এইভাবে সমস্ত অবস্থাতেই বুদ্ধিপূর্বক কর্ম করিবে ॥৩৮॥

'এই কার্যের সময় দেহ এইভাবে (দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট) থাকিবে।' এইরূপ স্থির করত (স্বাধ্যায়াদি) কার্য আরম্ভ করিয়া, নিষ্পাদন-কালে—মধ্যে মধ্যে, দেহ কী অবস্থায় আছে, তাহা দেখিতে হইবে (এবং সেই অবস্থায় না থাকিলে, তাহা সংশোধন করিতে হইবে) ॥৩৯॥

চিত্তরূপ মত্তহস্তী ধর্মচিন্তারূপ মহাস্তম্ভে বদ্ধ হইয়া সেই বন্ধন হইতে যাহাতে মুক্ত না হয়, সর্বপ্রযত্নে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে ॥৪০॥

মন আমার কোথায় রহিয়াছে (বিষয়-বস্তুতে বা অন্যত্র)। "সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া" সর্বদা তাহার প্রতি সেইভাবে লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে সে ক্ষণমাত্রও সমাধি-স্তম্ভকে পরিত্যাগ না করে ॥৪১॥

"অগ্নিদাহাদি" ভয় উপস্থিত হইলে, অথবা উৎসবাদির সময়, যদি (একাগ্রতায় অবস্থান করিতে) অসমর্থ হও, তবে সেই সময়ের জন্য স্বেচ্ছামতো চলিবে। "কর্তব্য বিষয়ের এইরূপ উপেক্ষা শাস্ত্র-সংগত"; কেননা, শাস্ত্রে, "দান"-কালে "শীলের" উপেক্ষার বিষয় উল্লিখিত আছে ॥৪২॥

বিবেচনাপূর্বক যাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তাহা ব্যতীত অন্য বিষয়ে চিন্তা করিবে না। তখন মনে প্রাণে তদ্গত হইয়া তাহাই নিষ্পন্ন করিবে ॥৪৩॥

এইরূপ করিলে সমস্ত কার্যই সুসম্পন্ন হইবে। নতুবা উভয়ের কোনোটিই হইবে না। এবং তাহাতে (চঞ্চলপ্রকৃতির জন্য) অসতর্কতাদোষও (অসংপ্রজন্য ক্লেশও) বৃদ্ধি পাইবে ॥৪৪॥

কোথাও যখন নানাপ্রকারের অসংলগ্ন বার্তালাপ বিচিত্রভাবে চলিতে থাকে, তখন তাহা শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য আসে। কিন্তু সেই আগত ঔৎসুক্যকে দমন করিবে। সমস্ত কৌতূহলকর ব্যাপারেই এইরূপ করিবে ॥৪৫॥

মৃত্তিকামর্দন, (নখাদির দ্বারা) তৃণচ্ছেদন, ভূমিতে রেখাদি অঙ্কন,[১] এই সমস্ত নিষ্ফল (নিষ্প্রয়োজনীয় মুদ্রাদোষ) ক্রিয়া, আরম্ভ হইলে, তথাগতের শিক্ষা স্মরণপূর্বক, সভয়ে সত্বর তাহা পরিত্যাগ করিবে ॥৪৬॥

[১] গৌতম-ধর্মসূত্র, ৯।৫১।

যখন কোথাও যাইবার কিংবা কিছু বলিবার ইচ্ছা হয়, তখন নিজ চিত্তকে পর্যবেক্ষণ করিয়া (তাহা অক্লিষ্ট অবস্থায় থাকিলে) প্রথমত তাহাকে ধৈর্যযুক্ত করিবে ॥৪৭॥

চিত্তকে যখন আসক্ত অথবা দ্বেষযুক্ত দেখিবে, তখন কিছু করিবে না, বা বলিবে না। তখন কাষ্ঠবৎ নিশ্চল থাকিবে ॥৪৮॥

মন যখন উদ্ধত, উপহাসপরায়ণ, মানমদসমন্বিত, অত্যন্ত বিদ্রূপকারী, কুটিল, এবং বঞ্চনা-পরায়ণ, মন যখন আত্মাভিমানী, পরনিন্দাপরায়ণ, অবজ্ঞা ও ক্রোধযুক্ত (বা কলহপরায়ণ), তখন কাষ্ঠবৎ নিশ্চল থাকিবে ॥৪৯-৫০॥

মন আমার লাভ, যশ ও সম্মানের অভিলাষী, দাসদাসী সেবকাদির "পরিচর্যার্থী এবং পাদধাবন-শরীরমর্দনাদি" সেবাসুখাকাঙ্ক্ষী। অতএব আমি কাষ্ঠবৎ নিশ্চল রহিব ॥৫১॥

মন আমার পরার্থবিমুখ, স্বার্থাভিলাষী, পরিষদাকাঙ্ক্ষী (শিষ্য-প্রশিষ্যাদি অনুগত-জন-সমাজাকাঙ্ক্ষী বা জনসভাভিলাষী), অভিভাষণকামী। অতএব আমি (কিছু না করিয়া) কাষ্ঠবৎ নিশ্চল রহিব ॥৫২॥

মন আমার অসহিষ্ণু, অলস, ভীত, প্রগল্ভ, মুখর, অতি পক্ষপাতী, অতএব আমি (কিছু না করিয়া) কাষ্ঠবৎ নিশ্চল রহিব ॥৫৩॥

চিত্তকে ঐ ভাবে সংক্লিষ্ট [ক্লেশ (কাম, ক্রোধ, মোহাদি)-যুক্ত] অথবা নিষ্ফল ব্যাপারে উদ্যত দেখিলে, তাহার প্রতিপক্ষের[১] সাহায্যে, বীর তাহাকে নিগৃহীত করিবে ॥৫৪॥

আমি আমার চিত্তকে সংশয়হীন, সুনিশ্চিত, সুপ্রসন্ন, অচঞ্চল, শ্রদ্ধাবান, (আরাধ্যের প্রতি) নম্র, লজ্জাশীল, স্খলনভীত, শান্ত, এবং সত্ত্বারাধনাতৎপর[২] করিব ॥৫৫॥

প্রাকৃতজনের পরস্পর-বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চিত্তকে খিন্ন হইতে দিব না। 'কামক্রোধাদি (ক্লেশ) উৎপন্ন হওয়ায় ইহা হইতেছে' "তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়াই উহারা (প্রাকৃত জনগণ) পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। আহা, পরাধীন (ক্লেশাধীন) উহারা", এই ভাবিয়া চিত্তকে উহাদের প্রতি দয়ান্বিত করিব ॥৫৬॥

অনবদ্য বিষয়ে, চিত্তকে সর্বদা নিজের ও অন্যের বশবর্তী করিয়া রাখিব। উহাকে নির্মান (মান-বর্জিত) করিয়া নির্মাণের ন্যায় (নির্মিত-পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্টরূপে) ধারণ করিব ॥৫৭॥

'বহুকালপরে, এই (চিত্তসংযমরূপ) শ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি।' এই কথা বার বার স্মরণ করিয়া, এইরূপ সুমেরুপর্বতবৎ, নিষ্কম্প, (কামাদি-বিতর্কপবনের দ্বারা) নিশ্চল চিত্ত ধারণ করিব ॥৫৮॥

১ যেমন কামের প্রতিপক্ষ অশুভ-ভাবনা।

২ জীবগণের প্রতি সেবাপরায়ণ।

"দেহ চিত্তের অধীন, চিত্ত সংযত হইলে দেহ স্বতই সংযত রহিবে। চিত্তরহিত দেহ সর্বসামর্থ্য-বর্জিত, তাহা না হইলে," আমিষ-গৃধ্নু গৃধ্রগণ যখন দেহকে ইতস্তত আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন দেহ কেন সে-বিষয়ে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া করে না ॥৫৯॥

হে মন, (যাহা তোমার সত্বা নহে, সেই) মাংসাস্থি-পুঞ্জকে তোমার সত্বা স্বীকার করিয়া কেন তুমি রক্ষা করিতেছ। ইহা যদি তোমা হইতে ভিন্ন হয়, তবে ইহা চলিয়া যাইলে তোমার কী ক্ষতি হইবে ॥৬০॥

"যাহা 'তুমি' নহ, তাহাকেও যদি 'তুমি' বলিয়া স্বীকার করো, তবে" তোমার কাষ্ঠ-নির্মিত প্রতিকৃতিকে তুমি কেন 'তুমি' বলিয়া স্বীকার করো না। উহা তো (তোমার দেহের অপেক্ষা) বেশ শুচি, পবিত্র। হে মূঢ়, এই পচনধর্মী অশুচি-বস্তু-নির্মিত যন্ত্রকে কেন রক্ষা করিতেছ ॥৬১॥

এই চর্ম-আবরণকে নিজ বুদ্ধির দ্বারা দেহ হইতে পৃথক করো। প্রজ্ঞাশস্ত্রের দ্বারা, অস্থিপঞ্জর হইতে মাংসকে মুক্ত করো। অস্থিসমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মজ্জাকে দর্শন করো। দেহাভ্যন্তরের তলদেশ পর্যন্ত (এইভাবে) দর্শন করো। (তাহার পর) উহাতে কী সার-পদার্থ আছে, তাহা স্বয়ং তুমিই বিচার করো[১] ॥৬২-৬৩॥

এইভাবে প্রযত্ন পূর্বক অন্বেষণ করিয়াও ইহাতে কোনো সার-পদার্থ তোমার দৃষ্টিগোচর হইল না। এখন বলো, কেন তুমি অদ্যাপি এই দেহ রক্ষা করিতেছ ॥৬৪॥

এই অশুচি বস্তু তোমার আহারে লাগিবে না। রক্তও তুমি পান করিবে না। অন্ত্রসমূহ চোষণ করিবে না। (বলো), দেহ লইয়া কী করিবে ॥৬৫॥

গৃধ্র-শৃগালাদির আহারের জন্য, কর্মের সাহায্যকারী (উপকরণ) এই শরীরকে মনুষ্য-গণের রক্ষা করা উচিত। "কিন্তু ইহাতে আসক্ত হওয়া উচিত নহে ॥"৬৬॥

(কেননা), এইরূপে রক্ষা করিতে থাকিলেও নির্দয় মৃত্যু এই দেহকে ছিনাইয়া লইয়া যখন গৃধ্রগণকে দান করিবে, তখন তুমি কী করিবে ॥৬৭॥

'সে থাকিবে না' এই ভাবিয়া তুমি ভৃত্যকে বস্ত্রাদি দান করো না। দেহও তো তোমার অন্ন-ধ্বংস করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহার জন্য তুমি ব্যয় করো কেন ॥৬৮॥

অতএব, হে মন, এই দেহকে (ভৃত্যের ন্যায় কেবল) বেতন দিয়া, অধুনা তোমার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লও। বেতনভোগী ভৃত্য কর্তৃক যাহা কিছু অর্জিত হয়, সেই সমস্তই কেহ তাহাকে দান করে না (তাহার সামান্য অংশমাত্রই বেতনাকারে তাহাকে দেওয়া হয়, অতএব দেহকেও সেইরূপ তাহার সামান্য অংশমাত্রই দিবে) ॥৬৯॥

১ এইরূপ ভাবনাকে বৌদ্ধশাস্ত্রে "অশুভ-ভাবনা" বলে। ইহার দ্বারা দৈহিক-রূপের প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। বিকৃত মৃতদেহ, অস্থিখণ্ড বা কঙ্কাল এইরূপ ভাবনার সহায়ক। অষ্টম পরিচ্ছেদের ৩০ হইতে ৭০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বিসুদ্ধিমগ্গের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ মিলিবে।

যাতায়াতের অবলম্বনহেতু, এই দেহকে নৌকা মনে করিয়া, জীবগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত উহার গতি তোমার ইচ্ছাধীন করিয়া লও ॥৭০॥

নিজেকে এইভাবে বশীভূত করিয়া, সর্বদা (প্রসন্ন-চিত্তে) হাস্তমুখে বিরাজ করিবে। ভ্রূকুটি এবং ললাট-সংকোচন বর্জন করিবে। সকলের সঙ্গে তুমিই প্রথম আলাপ করিবে। সমস্ত জগতের বন্ধু হইবে ॥৭১॥

"অনাবশ্যক" ত্বরার সহিত পীঠ (পীঁড়ি) প্রভৃতি সশব্দে নিক্ষেপ করিবে না। কিংবা কপাটে সবলে আঘাত করিবে না। সতত শব্দ-বর্জনে তোমার রুচি হউক ॥৭২॥

বক, বিড়াল, ও চোর, নিভৃতে, নিঃশব্দে চলিতে চলিতে, নিজের অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয়। যতিও সর্বদা এইভাবে চলিবে ॥৭৩॥

অন্যকে চালনা করিতে যাঁহারা দক্ষ, যাঁহারা অযাচিতোপকারী, তাঁহাদের (উপদেশ-) বাক্য অবনতশিরে গ্রহণ করিবে। সর্বদা সকলের শিষ্য হইয়া, সকলের নিকট হইতেই শিক্ষা করিবে ॥৭৪॥

অন্যের প্রশংসাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'সাধু সাধু' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। সুকৃতকারী ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া, প্রশংসার দ্বারা তাহাকে উৎসাহিত করিবে ॥৭৫॥

কাহারো সদ্গুণের কথা তাহার সমক্ষে না বলিয়া পরোক্ষে বলিবে। কেহ কাহারো সদ্গুণের কথা (সেই ব্যক্তির সমক্ষেও) বলিতে থাকিলে, সন্তোষের সহিত অনুমোদন করিবে। কেহ তোমার (সমক্ষে বা পরোক্ষে) গুণগান করিলে (অহংকৃত না হইয়া) তাহারই গুণানুরাগিতা (-রূপ সদ্গুণ-) সম্বন্ধে চিন্তা করিবে ॥৭৬॥

আমাদের যাহা কিছু উদ্যোগ, সমস্তই নিজের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য। সেই সন্তুষ্টি, বিত্তের দ্বারাও দুর্লভ। অতএব অন্যের শ্রমোপার্জিত সদ্গুণের দ্বারা আমি (এই অনায়াস-লব্ধ) সন্তুষ্টি-সুখ ভোগ করিব ॥৭৭॥

এই সন্তুষ্টি-সুখ লাভ করিতে আমার কিছুই ব্যয় হইল না। অথচ ইহা হইতে (কেবল ইহলোকে নহে) পরলোকেও মহাসুখ লাভ হইবে। বিদ্বেষে কিন্তু ইহলোকে অপ্রীতির দুঃখ এবং পরলোকেও মহাদুঃখ প্রাপ্তি হয় ॥৭৮॥

সর্বদোষ-বর্জিত-সুবিন্যস্ত-শব্দসংযুত, স্পষ্টার্থক, মনোরম, শ্রুতিসুখকর, করুণারসনিষ্যন্দি বাক্য মৃদুমন্দ-স্বরে উচ্চারণ করিবে ॥৭৯॥

ইহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া আমার বুদ্ধত্বলাভ হইবে, এই কথা চিন্তা করিয়া, প্রাণিগণকে সতত সরল দৃষ্টিতে দর্শন করিবে। "তোমার প্রীতিরসভরা দৃষ্টি দেখিয়া মনে হউক" তোমার নয়ন যেন তাহাদিগকে পান করিতেছে ॥৮০॥

অবিচ্ছিন্ন তীব্র শ্রদ্ধা এবং ক্লেশাদির প্রতিপক্ষ[১] হইতে মহাকল্যাণ উৎপন্ন হয়। গুণ-ক্ষেত্রে (বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বাদিতে) উপকারী-ক্ষেত্রে (মাতা পিতা ইত্যাদিতে) এবং দুঃখী-জনে যাহা কিছু করা যায়, তাহা হইতেও মহাকল্যাণ উৎপন্ন হয় ॥৮১॥

সর্বদা উৎসাহসম্পন্ন হইবে। সুদক্ষ হইবে। সমস্ত কার্য স্বয়ং করিবে। কাহাকেও কোনো কার্য করিবার অবকাশ দিবে না ॥৮২॥

দান, শীল, ক্ষান্তি আদি পারমিতাসমূহ ক্রমানুসারে এক হইতে অন্য শ্রেষ্ঠতর, ইহাদের মধ্যে নিকৃষ্টের জন্য উৎকৃষ্টকে পরিত্যাগ করিবে না। বোধিসত্ত্বগণের কুশল-বারিধির সেতুবন্ধ স্বরূপ-আচরণসমূহ ভিন্ন অন্যত্র ঐ ক্রম রক্ষা করিবে[২] ॥৮৩॥

ইহা অবগত হইয়া, সর্বপ্রাণীর হিতসুখবিধানের জন্য সতত উদ্যত রহিয়ো। (স্বার্থত্যাগী) কৃপালু, (প্রজ্ঞাচক্ষুসম্পন্ন, জীবগণের হিতসুখাদি) অর্থদর্শী ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ বস্তুও অনুজ্ঞাত হইয়াছে ॥৮৪॥

ভিক্ষালব্ধ আহার্য গ্রহণ করিয়া, তাহার এক অংশ বিপন্ন আতুরকে, এক অংশ অনাথকে, এবং অন্য এক অংশ ব্রতস্থ ব্রহ্মচারীকে দান করিয়া চতুর্থ অংশ স্বয়ং ভোজন করিবে। "যাহাতে গুরু না হয় এবং লঘুও না হয় সেইরূপ" মধ্যমমাত্রায় আহার করিবে। তিনখানি চীবর (ও পাত্র) ব্যতীত নিজ অধিকৃত সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করিবে ॥৮৫॥

সদ্ধর্মের[৩] সেবক এই দেহকে তুচ্ছ কারণে পীড়া দিবে না। এইভাবেই (অনর্থক পীড়া না দিয়া, প্রথমে সুকুমার-ভাবে ধীরে ধীরে, বর্ধিত হইতে দিলে) ইহা সত্বর সত্ত্বগণের আশা পূর্ণ করিবে ॥৮৬॥

চিত্ত যখন অশুদ্ধ, যখন মিত্র, অমিত্র, উদাসীন আদি ভেদজ্ঞানে তাহা কলুষিত (অর্থাৎ যখন মিত্র, অমিত্র, উদাসীনাদি সর্ব আতুর-জনের প্রতি চিত্তে সমভাব আসে নাই), তখন করুণা উৎপন্ন হইলে, প্রাণদান করিবে না। চিত্তে যখন সর্ব আতুর-জনের প্রতি সমভাব আসিবে তখন প্রাণদান করিবে। তাহা হইলে ঐ দান ব্যর্থ হইবে না[৪] ॥৮৭॥

১ ক্লেশের (কাম, ক্রোধ, মোহাদির) প্রতিপক্ষ—অশুভ-ভাবনা, শূন্যতা-ভাবনা।

'এই দেহ অশুচি, অপবিত্র। ইহার অন্তর বাহির অশুচি বস্তুতে পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা একটি চলমান মলাধার।' দেহের প্রতি (বা দৈহিক রূপের প্রতি) বিতৃষ্ণা জন্মাইবার জন্য, চিত্তের এইরূপ চিন্তাধারাকে, 'অশুভ-ভাবনা' বলা হয়। শূন্যতার বিষয় ভূমিকায় বলা হইয়াছে।

২ অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব-চরিত্রকেই সর্বোপরি স্থান দিবে। উহা অনুসরণ করিতে গিয়া, যদি ঐ ক্রম ভঙ্গ হয়, তবে তাহাতেও সংকুচিত হইবে না।

৩ বোধিসত্ত্বাদি সৎপুরুষের ধর্ম।

৪ বোধিসত্ত্ব সর্বজীবের জন্য তাঁহার দেহ উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া অকালে উহা দান করা উচিত নহে। শিশুকালে অপরিণত অবস্থায় পরিণত ব্যক্তির সাধনোপযোগী কার্য আরম্ভ করিলে, সেই কার্য ব্যর্থ হয়। কর্তারও অনর্থক পরিশ্রম হয়। যে-শক্তি—স্ফুলিঙ্গ পরিণত অবস্থায় সমস্ত জগৎ উদ্ধার করিবে, তাহাকে অপরিণত অবস্থায় নষ্ট করিলে উহা সমস্ত জগতের পক্ষে ক্ষতিকর।

বোধিচিত্ত-বীজ, বীজাবস্থায় যাহাতে নষ্ট না হয়, তাহার জন্যই এইরূপ সতর্কতা। কিন্তু তাই বলিয়া "এখনও সময় হয় নাই" এইরূপ ছল করিয়া কেহ কদাপি মনকে আত্মত্যাগে প্রস্তুত করিতে বিরত হইবে না। কেননা, আত্মত্যাগে নিজেকে প্রস্তুত করিতে না পারিলে কখনো আত্মত্যাগ সম্ভব হইবে না।

শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ধর্মের কথা বলিবে না। উষ্ণীষধারী, ছত্র-ধারী, দণ্ডধারী, সশস্ত্র, শিরোবগুণ্ঠিত ব্যক্তিকেও ধর্মের কথা বলিবে না। সুস্থব্যক্তি সম্বন্ধেই এই নিয়ম। "অসুস্থ আতুর ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কোনো নিয়ম নাই" ॥৮৮॥

গম্ভীর (মেধাহীন ব্যক্তির দুরধিগম্য) এবং উদার (অতি উচ্চস্তরের) ধর্মের[১] কথা, অসংস্কৃতবুদ্ধিকে বলিবে না। অন্য কোনো পুরুষ সঙ্গে না থাকিলে স্ত্রীলোকের নিকট একাকী ধর্মের কথা বলিবে না।

হীন (হীনযান-কথিত) ও উৎকৃষ্ট (মহাযান-ভাষিত) ধর্মের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে ॥৮৯॥

যে-ব্যক্তি গম্ভীর ও উদার ধর্ম (মহাযান) গ্রহণের যোগ্য তাহাকে হীনধর্মে (হীনযানে) নিযুক্ত করিবে না; ধর্মাচরণ বর্জন করাইয়া কেবল সূত্রমন্ত্রে (সূত্রাদিপাঠেই শুদ্ধি হইবে এই বলিয়া) কাহাকেও প্রলোভিত করিবে না ॥৯০॥

দন্তকাষ্ঠ (দাঁতন) ও শ্লেষ্মা অপাবৃতভাবে ত্যাগ করা উচিত নহে। জলে বা ব্যবহৃতস্থানে মূত্রাদি ত্যাগ গর্হিত কার্য ॥৯১॥

অত্যধিক মুখব্যাদন করত পরিপূর্ণমুখে সশব্দে ভোজন করিবে না। লম্বমান চরণে (বা পা ঝুলাইয়া) উপবেশন করিবে না। দুই বাহু যুগপৎ মর্দন করিবে না ॥৯২॥

সঙ্গীহীনা স্ত্রীলোকের সহিত গমন, উপবেশন বা শয়ন করিবে না। যাহা কিছু লোকের অসন্তোষজনক তাহা "শাস্ত্রে" দেখিয়া বা "বিজ্ঞজনকে" জিজ্ঞাসা করিয়া বর্জন করিবে ॥৯৩॥

(তর্জনী প্রভৃতি) এক অঙ্গুলীর দ্বারা কাহাকেও কিছু দেখাইবে না। সমগ্র দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সাদরে দেখাইবে। (সামান্য) পথ পর্যন্ত ঐ ভাবেই দেখাইবে ॥৯৪॥

সামান্য প্রয়োজনে কাহাকেও বাহু উৎক্ষেপণ করিয়া আহ্বান করিবে না। সেরূপ অবস্থায় করতালি (ইত্যাদি) দিবে। নতুবা অসংবৃত বা উদ্ধত বলিয়া গণ্য হইবে ॥৯৫॥

ভগবান বুদ্ধ যে-ভাবে নির্বাণশয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন,[২] নিজের ইচ্ছামত যে-কোনো দিকে মস্তক রাখিয়া সেইভাবে শয়ন করিবে।

সচেতন হইয়া নিদ্রা যাইবে এবং কেহ জাগাইয়া তুলিবার পূর্বেই (জৃম্ভণাদি আলস্যে কালাতিপাত না করিয়া) সত্বর উঠিয়া পড়িবে ॥৯৬॥

বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষণীয় আচার অসংখ্য বলিয়া কথিত আছে। (তাহাদের সমষ্টিরূপে) প্রথমত চিত্তশোধন আচার অবশ্য অভ্যাস করিবে ॥৯৭॥

১ যেমন শূন্য-বাদাদি।

২ দক্ষিণ-পার্শ্বে, এক চরণের উপর অন্যচরণ স্থাপন পূর্বক, দক্ষিণ বাহুকে উপাধান করিয়া, প্রসারিত বামবাহু জঙ্ঘার উপর ন্যস্ত করিয়া চীবরের দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন পূর্বক শয়ন করিবে।

দিনে তিনবার এবং রাত্রে তিনবার, পাপদেশনা, পুণ্যাহুমোদন এবং বোধিচিত্ত-পরিগ্রহ এই ত্রিস্কন্ধ প্রবর্তন করিবে। এই ত্রিস্কন্ধের দ্বারা এবং বোধিচিত্ত ও তথাগতের শরণ লইয়া, অবশিষ্ট পাপসমূহেরও উপশম হইবে ॥৯৮॥

স্বয়ং স্বাধীনভাবে বা পরাধীন (পরার্থে প্রবৃত্ত) হইয়া যে-যে অবস্থায় যাইতে হয়, সেই সেই অবস্থায় যে-যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা অতি যত্নে শিক্ষা করিবে ॥৯৯॥

জগতে এমন কোনো (শিক্ষণীয়) বিষয় নাই, যাহা জিনাত্মজগণের শিক্ষণীয় নহে। এইভাবে (সকলের হিত-সুখ-বিধানের জন্য নরকপর্যন্ত, সর্বত্র) বিচরণশীল সাধুজনের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা পুণ্য নহে[১] ॥১০০॥

সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে জীবগণের যাহা হিতসুখকর তাহাই সম্পাদন করিবে। ইহার অন্যথা করিবে না। জীবগণের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই সমস্ত কুশলমূলকে[২] বোধিতে পরিণত করিবে ॥১০১॥

মহাযান-ধর্মবেত্তা, বোধিসত্ত্ব-ব্রত-ধারী কল্যাণ-মিত্রকে প্রাণভয়েও কদাচ পরিত্যাগ করিবে না ॥১০২॥

'শ্রীসংভব-বিমোক্ষ' হইতে (কল্যাণমিত্ররূপ) গুরুর প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত তাহা শিক্ষা করিবে। এই গ্রন্থে উক্ত এবং যাহা এই গ্রন্থে নাই "বোধিসত্ত্বগণের কর্তব্য বিষয়ক" এরূপ বুদ্ধবচন-সমূহ, নানা সূত্রান্ত-গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইবে ॥১০৩॥

'রত্নমেঘাদি' মহাযান সূত্রগ্রন্থে বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষণীয় বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ সূত্রগ্রন্থ-সমূহ পাঠ করিবে। বোধিসত্ত্বগণের (অষ্টপ্রকার) মূলাপত্তি (মূল পাপ) কী, তাহা 'আকাশ-গর্ভসূত্রে' দর্শন করিবে (বা অন্বেষণ করিবে) ॥১০৪॥

'শিক্ষাসমুচ্চয়' গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ অবশ্যই দর্শন করিবে। কারণ ঐ গ্রন্থে বোধিসত্ত্বগণের সদাচারের বিষয় বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥১০৫॥

'সূত্রসমুচ্চয়' গ্রন্থও দেখিতে পার। উহাতে ঐ সদাচারের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। আর্য নাগার্জুন-রচিত দ্বিতীয় (শিক্ষাসমুচ্চয় ও) 'সূত্রসমুচ্চয়' সযত্নে দর্শন করিবে ॥১০৬॥

"ঐ গ্রন্থ সমূহে" যাহা নিবারণ করা হইয়াছে এবং যাহা কর্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই শিক্ষণীয় বিষয় দর্শন করিয়া আচরণ করিবে। "জনগণের চিত্ত যাহাতে প্রকুপিত না হইয়া শান্ত থাকে সেইভাবে" লোক-চিত্ত-রক্ষার জন্যই তাহা আচরণ করিবে ॥১০৭॥

১ অর্থাৎ ইঁহাদের শিক্ষণীয় বিষয় যেমন সীমাহীন, সেইরূপ পুণ্যও ইঁহাদের সীমাহীন।

২ কুশলমূল—অলোভ অদ্বেষ, অমোহ। লোভ দ্বেষ, ও মোহের অভাবই সমস্ত কুশল-কর্মের উৎপত্তির কারণ। সেইজন্যই উহাকে "কুশলমূল" বলা হয়।

দেহ কিভাবে আছে এবং চিত্তই বা কিভাবে আছে, বার বার তাহা দর্শন করার (বা পরীক্ষা করার) নাম 'সংপ্রজন্য'। ইহাই 'সংপ্রজন্যের' সংক্ষিপ্ত লক্ষণ ॥১০৮॥

দেহের দ্বারাই (অর্থাৎ কর্মের দ্বারাই) আমি পাঠাভ্যাস করিব। বাক্যের দ্বারা পাঠাভ্যাস করিয়া কী হইবে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের পাঠমাত্রে রোগীর কী ফললাভ হইবে ॥১০৯॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"বহ্নির কণা যেমন তৃণসমষ্টিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ" জীবের প্রতি বিদ্বেষ সহস্র-কল্পোপার্জিত এই সমস্ত কুশলকর্ম, দান এবং বুদ্ধের পূজা সমুদয় নষ্ট করে ॥১॥

দ্বেষের সমান পাপ নাই এবং ক্ষমার (বা সহনশীলতার) সমান পুণ্য (তপ) নাই। অতএব পরমযত্নে এবং নানা উপায়ে ক্ষমা অভ্যাস করা উচিত ॥২॥

হৃদয়ে দ্বেষ[১] থাকিলে, মনে শান্তি থাকে না, সন্তোষ থাকে না। নিদ্রা আসে না এবং ধৈর্যের অভাব হয় ॥৩॥

"দ্বেষযুক্ত (কর্কশচিত্ত) দুর্ভাগ্য মনুষ্যের জীবন বড়ই দুর্বহ।" তিনি যাহাদের অর্থ এবং সম্মানে ভূষিত করেন, যাহারা তাঁহার আশ্রিত, তিনিই যাহাদের জীবিকার উপায়, তিনি যাহাদের প্রভু, তাহারাও দ্বেষ-দুর্ভাগ্য-পীড়িত-তাঁহার অপকার (এমন কি তাঁহাকে হত্যা পর্যন্ত) করিতে চাহে ॥৪॥

তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ভয় করেন; অর্থদান করিয়াও তিনি সেবক পান না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এমন কোনো উপায় নাই, যাহার দ্বারা ক্রোধীব্যক্তি সুখলাভ করিতে বা সুস্থির হইতে পারে ॥৫॥

ক্রোধ[১] এইরূপ বহুপ্রকার দুঃখ সৃষ্টি করে। অতএব তাহাকে শত্রুস্বরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি প্রগাঢ় অভিনিবেশসহকারে, তাহার বিনাশসাধন করে, সে ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়ত্রই সুখী হয় ॥৬॥

যাহা ইচ্ছা করি না, তাহা করিলে, এবং যাহা ইচ্ছা করি, তাহার ব্যাঘাত করিলে, আমাদের দৌর্মনস্য অর্থাৎ মানসিক অশান্তি উৎপন্ন হয়। মানসিক অশান্তি, এই দ্বেষের খাদ্য-স্বরূপ। এই খাদ্য লাভ করিয়া সে অত্যন্ত (বলবান ও) দৃপ্ত হয় এবং আমার বিনাশ-সাধন করে। অতএব আমি আমার এই শত্রুর খাদ্য (সর্বপ্রথমে) নষ্ট করিব। কারণ, আমার বিনাশ ব্যতীত, এই শত্রুর অন্য করণীয় কার্য কিছু নাই ॥৭-৮॥

একেবারেই যাহা ইচ্ছা করি না, এমন পরম অনিষ্টও যদি কিছু আমার নিকট আসে, তথাপি আমার মানসিক প্রফুল্লতাকে ক্ষুব্ধ করা উচিত নহে। কারণ মানসিক প্রফুল্লতা নষ্ট করিয়া দুর্মনা হইলেও আমার অভিলষিত বস্তু (ইষ্ট) লাভ হইবে না। উপরন্তু, যাহা কুশল তাহাও নষ্ট হইবে ॥৯॥

যদি "অনিষ্ট-প্রাপ্তি এবং ইষ্ট ব্যাঘাতের" প্রতিকারের উপায় থাকে, তাহা হইলে

১ দ্বেষ ও ক্রোধ এখানে প্রায় এক অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকার বলেন—"চিত্তের কর্কশ অবস্থা দ্বেষ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন বৃত্তির নাম ক্রোধ।" অর্থাৎ অন্তরের ঐ রুক্ষতার বহিঃপ্রকাশই ক্রোধ।

দুর্মনা হও কেন। (প্রতিকারের চেষ্টা করো, পুনরায় সব ঠিক হইয়া যাইবে) আর যদি প্রতিকারের উপায় না থাকে, তাহা হইলেই বা (অনর্থক) দুর্মনা হইয়া কী হইবে ॥১০॥

দুঃখ (দৈহিক), ধিক্কার, মর্মঘাতী বাক্য, অযশ আদি (মানসিক দুঃখ) আমি আমার বা আমার প্রিয়ব্যক্তির জন্য ইচ্ছা করি না। কিন্তু শত্রুর জন্য যাহা ইচ্ছা করি না, তাহা ইহার বিপরীত ; অর্থাৎ কিনা তাহার জন্য ইহাই (দুঃখ-ধিক্কারাদি) ইচ্ছা করি ॥১১॥

সংসারে সুখ কদাচিৎ লাভ করা যায়। দুঃখ অতি সহজেই, অনায়াসেই মিলে। "সুতরাং দুঃখে অভ্যস্ত হওয়া কঠিন নহে।" দুঃখের দ্বারাই এই সংসার (অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর কবল) হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। অতএব হে চিত্ত, দুঃখ দেখিয়া কাতর হইও না, দৃঢ় হও ॥১২॥

কর্ণাট (বা দাক্ষিণাত্য) দেশীয় দুর্গা বা চণ্ডীর ভক্তগণ, নিজ নিজ দেহকে দগ্ধ ও ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া "স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া," নিষ্ফল দুঃখ সহ্য করে[১]। তাহারা যদি বৃথাই এইরূপ দুঃখ সহ্য করে, তাহা হইলে মুক্তির জন্য আমি কি তাহা সহ্য করিতে পারিব না। কেন তবে কাতর হইতেছি ॥১৩॥

সংসারে এমন কিছু নাই, যাহা অভ্যাসের দ্বারা করা যায় না। অতএব মৃদু-বাধা অভ্যাস করিতে করিতে মহা-বাধাও সহ্য হইয়া যাইবে ॥১৪॥

দংশ (ডাঁশ) মশকাদি জীব হইতে আমরা (সর্বদাই) কষ্ট পাই। ক্ষুৎ-পিপাসাদি আমাদের বেদনা দেয়। কণ্ডু (চুলকানি, দাদ) আদি হইতে আমরা মহা দুঃখ ভোগ করি। ঐ সমস্ত দুঃখই আমরা অনর্থক ভোগ করি, ইহা কি তুমি লক্ষ্য কর না। "তবে মুক্তির জন্য দুঃখ ভোগ করিতে ভয় পাও কেন।"॥১৫॥

[কিন্তু এই সহজ-লভ্য দুঃখ হইতে আমরা (মুক্তির জন্য) দুঃখ অভ্যাসের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি।]

শৈত্য, উষ্ণতা, বৃষ্টি, বাত্যা, পথশ্রম, বন্ধন, তাড়না প্রভৃতির সহিত, মিষ্ট ব্যবহার করিতে নাই। করিলে ব্যথা বাড়িতেই থাকে ॥১৬॥

নিজের রক্তপাত দেখিয়া কেহ কেহ অধিকতর বিক্রম প্রকাশ করে। আবার কেহ বা পরের রক্ত দেখিয়াও মূর্ছা যায়। চিত্তের দৃঢ়তা ও কাতরতা হইতেই এইরূপ ভাব আসে। অতএব দুঃখের নিকট দুর্ধর্ষ হইবে। বাধাকে পরাভূত করিবে ॥১৭-১৮॥

---

১ আজিও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ইহার প্রভূত প্রচলন আছে। আমাদের গাজনের সন্ন্যাসীর ন্যায় বহুব্যক্তি রোগমুক্তি আদি প্রার্থনা ("মানসিক") করিয়া, "মারী অম্মন" বা "মরাম্ম" (শীতলা), "সুব্রহ্মণ্য" (কার্তিক) প্রভৃতি দেব-দেবীর নিকট জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের নানাস্থানে লৌহশলাকা (লোহার শিক) বিদ্ধ করিয়া নৃত্য করে। পার্শ্বদেশে, চর্মের ভিতর রথের রশি প্রবেশ করাইয়া রথ আকর্ষণ করে। প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর চলিতে থাকে লৌহশলাকা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, শরীরে বিদ্ধ করে।

জ্ঞানীব্যক্তি দুঃখের মধ্যেও চিত্তের প্রফুল্লতাকে ক্ষুব্ধ করিবে না। রাগ, দ্বেষ, মোহাদির সহিত আমাদের যুদ্ধ; এবং যুদ্ধে ব্যথা অতি সুলভ ॥১৯॥

শত্রুর অস্ত্রাঘাত বক্ষে লইবার ইচ্ছা করিয়া, যাহারা শত্রুকে জয় করে, তাহারাই বিজয়ী বীর। ইহা না করিয়া (ছল-কৌশলে) যাহারা শত্রু জয় করে, তাহারা তো মৃত-মারক ॥২০॥

দুঃখ হইতে বৈরাগ্য জন্মে—অহংকার দূর হয়। সংসারী ব্যক্তির প্রতি করুণা হয়। পাপে ভীতি এবং ভগবানে ভক্তি হয়। ইহা দুঃখের অন্য আর এক গুণ ॥২১॥

"অনিষ্টকারীর উপর আমার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। আর অনিষ্টকারীর উপর ক্রুদ্ধ হইতে হইলে, শরীরস্থ বায়ু, পিত্তাদি দোষত্রয়ের উপরই আমার প্রথম ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা, উহারাই কুপিত হইয়া, শরীরে নানা ব্যাধি উৎপন্ন করত, যতপ্রকার দুঃখ দেয়।

তথাপি আমি উহাদের উপর ক্রুদ্ধ হই না। কেননা, উহারা অচেতন ও পরাধীন। সজ্ঞানে স্বাধীনভাবে কুপিত হইবার ক্ষমতা উহাদের নাই। যে-উপাদানে উহারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই (অর্থাৎ উহাদের কারণ-সমূহই) উহাদিগকে কুপিত হইতে বাধ্য করে।

সচেতন সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। সজ্ঞানে, স্বাধীনভাবে, কুপিত হইয়া যে উহারা আমাদের অনিষ্ট করে, বা দুঃখ দেয়, তাহা নহে। প্রাক্তন কর্মদোষ হইতেই উহা হয়। প্রাক্তনকর্মসমূহই—কারণ, উপাদান বা নিমিত্ত (হেতু-প্রত্যয়)-রূপে উহাদিগের স্বভাব গঠিত করিয়াছে। তাহারাই উহাদিগকে কুপিত করিয়া, অপরের অনিষ্ট করিতে বাধ্য করে।"

মহাদুঃখ সৃষ্টি করিলেও (অচেতন) পিত্তাদির উপর আমার ক্রোধ হয় না। সচেতনের উপর আমার ক্রোধ হয় কেন। তাহারাও তো (অচেতন পিত্তাদির ন্যায়) তাহাদের, প্রত্যয়-কর্তৃক কুপিত হইতেছে ॥২২॥

"সচেতন ও অচেতন উভয়েই সমান পরাধীন।" পিত্তাদির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই যেমন শূল-বেদনা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণিগণ ইচ্ছা করুক বা না করুক, ক্রোধ বলপূর্বক উৎপন্ন হয় ॥২৩॥

লোকে 'এইবার আমি কুপিত হইব' এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বেচ্ছায় কুপিত হয় না। ক্রোধও 'এইবার আমি উৎপন্ন হইব' এইরূপ সংকল্প করিয়া (স্বাধীনভাবে) উৎপন্ন হয় না ॥২৪॥

যতপ্রকারের অপরাধ, যতরকমের পাপ, সমস্তই নিজ নিজ কারণ বা নিমিত্ত-বশতই (হেতু-প্রত্যয়-বশতই) উৎপন্ন হয়। সকলেই পরতন্ত্র, স্বতন্ত্র কেহই নহে ॥২৫॥

কারণ, উপাদান, বা নিমিত্ত সমূহের (হেতুপ্রত্যয়ের) 'আমি ইহাকে উৎপন্ন

করিতেছি' এইরূপ কোনো চেতনাবুদ্ধি নাই। আবার উৎপন্ন বস্তুরও 'আমি ইহার দ্বারা উৎপন্ন হইতেছি বা হইলাম'—এইরূপ কোনো চেতনাবুদ্ধি নাই ॥২৬॥

"সত্ত্ব, রজ ও তমের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, বা" প্রধান বলিয়া যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং আত্মা বলিয়া যাহা কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও 'আমি উৎপন্ন হইব' এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া উৎপন্ন হয় না ॥২৭॥

তাহা যদি পূর্বে না থাকে, তবে তাহা অসৎ। (বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়) যদি তাহা অসৎ অর্থাৎ নাই-ই, তবে উৎপন্ন হইতে চায় কে।

আত্মা যদি পূর্বে ভোক্তা না থাকে এবং পরে ভোক্তা হয়, তবে তাহার মধ্যে ভোক্তৃত্ব বলিয়া যাহা ছিল না, তাহা কেমন করিয়া আসে। এখানেও অসতের (অর্থাৎ যাহা নাই, তাহার) উৎপত্তি-প্রসঙ্গ আসিতেছে।

বিষয়-ভোগে অপ্রবৃত্তিই যাহার স্বভাব, সে কেমন করিয়া বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হয়। যদি তাহার বিষয়-ভোগে প্রবৃত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিষয়-ভোগে ব্যাপৃত-স্বভাব যে আত্মা তাহার আর বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে ॥২৮॥

আত্মাকে নিত্য, অচেতন, আকাশ-বদ্ ব্যাপী এবং অক্রিয় বলা হয়।

পূর্বে এবং পরে সর্বদা যাহার স্বভাব এক, সেই নিত্য। পূর্বে অভোক্তৃত্ব-স্বভাববান্ এবং পরে ভোক্তৃত্ব-স্বভাববান্ হইলে নিত্য হয় কেমন করিয়া।

জ্ঞান-প্রযত্নাদি অন্য কোনো নিমিত্ত-সংযোগেও নির্বিকারের কোনোরূপ ক্রিয়া যুক্তি-যুক্ত নহে ॥২৯॥

পূর্বে যেরূপ ছিল, ক্রিয়াকালেও যদি সে সেইরূপই রহিল, তবে ক্রিয়া সম্বন্ধে সে করিল কী। 'তাহার ক্রিয়া'—"এইরূপ সম্বন্ধের ভিত্তি কোথায়।" (তাহাদের উত্তরের মধ্যে) এইরূপ সম্বন্ধের নিমিত্ত কে ॥৩০॥

[সুতরাং আত্মা এবং প্রকৃতি সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী :—]

এইরূপে সংসারের সকলেই পরাধীন। যাহার অধীন সেও স্বাধীন নহে। নির্মিত পুত্তলিকাবৎ সকল বস্তুই নিশ্চেষ্ট, "সকলেই অপরের ক্রীড়নক হইয়া কার্য করিতেছে।" কোথায় কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব ॥৩১॥

প্রশ্ন উঠিবে, যদি এইরূপ সকলেই পরাধীন, কেহই স্বাধীন নহে, সকলেই যদি পুত্তলিকাবৎ অপরের ক্রীড়নক হইয়া কার্য করিতেছে, তাহা হইলে, ইহা নিবারণও সম্ভব নহে। সকলেই পুত্তলিকা, কে কী নিবারণ করিবে।

ইহার উত্তর এই যে, না,—নিবারণ সম্ভব। একটিকে অবলম্বন করিয়া আর একটি উৎপন্ন হয়। আবার তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর একটি উৎপন্ন হয়, এইরূপে পূর্ব পূর্ব বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া অপরাপর বস্তু বা বিষয় উৎপন্ন হইতেছে বলিয়াই বারণ

সম্ভব। একের প্রবর্তনে যেমন অপরের প্রবৃত্তি হইতেছে, তেমনি একের নিবর্তনে অপরের নিবৃত্তিও সম্ভব হইবে। সুতরাং সংসারের সর্বদুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব[১] ।।৩২।।

অতএব মিত্রই হউক অথবা অমিত্রই হউক, কাহাকেও অন্যায় করিতে দেখিয়া দুর্মনা হইও না। এইরূপ (অপকার-করণশীল) কারণ-সমূহ ইহার মধ্যে রহিয়াছে বলিয়াই এ অপকার করিতেছে, ইহা মনে করিয়া প্রফুল্ল থাকিও।৩৩।।

"ইচ্ছা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না।" প্রাণিমাত্রের যদি ইচ্ছা করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইত, তাহা হইলে সংসারে কাহারও দুঃখ হইত না। কেননা, দুঃখ কেহই কামনা করে না ।।৩৪।।

প্রমাদ ও ক্রোধবশত এবং দুর্লভ পরদারাদি লাভাকাঙ্ক্ষায়, লোকে কণ্টকাদির দ্বারা নিজে নিজেকে আঘাত করে; আহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকে; কেহ উদ্বন্ধনের দ্বারা, কেহ উচ্চস্থান হইতে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করিয়া, কেহ বা অপথ্য বা বিষাদি ভক্ষণ করিয়া আত্মহত্যা করে; কেহ বা পাপাচরণের দ্বারা, অর্থাৎ অন্যকে হত্যা করিতে গিয়া অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে, নিজের বিনাশ সাধন করে।

"পরাধীন না হইয়া স্বাধীন হইলে কি এমন হইত। সকলেই নিজের সুখ কামনা করে; দুঃখ কামনা করে কে।"

কামক্রোধাদির অধীনতাহেতু হতভাগ্য জীব যখন (সংসারে সর্বাপেক্ষা) প্রিয় আপনাকেই এইভাবে পীড়ন বা হত্যা করে; তখন অপরের অপকার করিবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে ।।৩৫ ৩৭।।

"পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি নানারূপ ক্ষতিকর কায করিলেও, আমরা তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই না। বরং তাহার উপর আমাদের দয়াই হয়। তাহা হইলে"—কাম-ক্রোধাদি (-রূপ পিশাচের) দ্বারা অভিভূত যে-জনসংঘ উন্মত্ত হইয়া, ঐ ভাবে (অথবা পরাপকারাদি পাপাচরণের দ্বারা) আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে, তাহাদের উপর দয়া না হইয়া ক্রোধ হয় কিরূপে ।।৩৮।।

অগ্নির স্বভাবই দগ্ধ করা, সেজন্য অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও, অগ্নির উপর আমরা ক্রুদ্ধ হই না। সেইরূপ যদি পরের অপকার করা মূর্খদের স্বভাব বলিয়াই ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে ।।৩৯।।

যদি ধরা যায়, জীবগণ স্বভাবত শুদ্ধ; ঐ দোষ (দ্বেষাদি) আগন্তুক। তাহা হইলেও জীবের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। "স্বভাবত নির্মল" আকাশ কটু-ধূমে পূর্ণ হইলে কেহ কি তাহার উপর ক্রুদ্ধ হয় ।।৪০।।

১ ইহা ভাবানুবাদ।

[যখন কেহ দণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া, আমাকে আঘাত করে, তখন আমি ঐ দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না। ঐ দণ্ডাদি যাহার দ্বারা প্রেরিত হয় তাহার উপরেই ক্রুদ্ধ হই]

মুখ্য দণ্ডাদিকে ত্যাগ করিয়া, যদি আমি তাহার প্রেরকের উপর ক্রুদ্ধ হই, তবে দ্বেষের প্রতিই আমার দ্বেষ হওয়া উচিত। কেননা, সেই দণ্ডাদির প্রেরকও দ্বেষের দ্বারাই প্রেরিত হয় ॥৪১॥

পূর্বজন্মে আমিও জীবগণকে এইরূপ পীড়া দিয়াছিলাম। অতএব জীবের প্রতি উপদ্রবকারী আমার ইহা যোগ্যই হইয়াছে ॥৪২॥

"যাহার দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয় সেই" অস্ত্র, এবং "যেখানে আমি আঘাত পাই আমার সেই" দেহ, এই উভয়ই দুঃখের কারণ। অস্ত্রধারী শত্রু এবং দেহধারী আমি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব ॥৪৩॥

স্পর্শমাত্রেই যাহা ব্যথা পায়, সেই দেহ নামক পক স্ফোটক, আমি স্বয়ং তৃষ্ণান্ধ হইয়া গ্রহণ করিয়াছি। সেই দেহে ব্যথা পাইয়া আমি কোথায় কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব ॥৪৪॥

দুঃখ আমি চাহি না। অথচ দুঃখের কারণ এই দেহ আমি চাই। এমনই মূর্খ আমি। আমার দোষেই যখন আমার দুঃখ, তখন অন্যত্র কেন আমি ক্রুদ্ধ হই ॥৪৫॥

আমার (পাপ-) কর্মবশত যেমন নরকে অসির ন্যায় পত্রসম্পন্ন-বৃক্ষপূর্ণ-অরণ্যের উৎপত্তি হয়; "এবং সেই অরণ্যে অয়োমুখ গৃধ্রবায়সাদি" নারকীয় পক্ষীর আবির্ভাব হয়, সেইরূপ (পরশস্ত্রাদি-আঘাত-জনিত) আমার এই দুঃখ আমারই কর্মফল। অতএব কোথায় কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব ॥৪৬॥

"আমি পূর্বে ইহাদের অপকার করিয়াছিলাম"। আমার সেই পাপকর্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহারা আমার অপকারী হইয়া জন্মিয়াছে। পরে এই দুষ্ট কর্মের জন্য ইহারা নরকে যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, আমিই ইহাদের নষ্ট করিলাম ॥৪৭॥

এই অপকারিগণকে অবলম্বন করিয়া, ইহাদিগকে বহুবার ক্ষমা করিতে করিতে (সেই ক্ষমাগুণের দ্বারা), আমার প্রাক্তন পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। এদিকে আমাকে অবলম্বন করিয়া (ইহাদের হিংসা-দ্বেষাদি উৎপন্ন হওয়ায়), ইহারা দীর্ঘকাল দুঃখদায়ী নরকে গমন করে।

"তাহা হইলে দেখা যাইতেছে" আমিই ইহাদের অপকারী এবং ইহারা আমার উপকারী। ইহার বিপরীত কল্পনায়, হে খলচিত্ত, কেন তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ ॥৪৮-৪৯॥

"প্রশ্ন হইবে, ইহারা যদি তোমার উপকারী এবং তুমি যদি ইহাদের অপকারী, তবে তোমারই নরকে যাওয়া উচিত। অন্তত: ইহাদিগকে তোমার রক্ষা করা উচিত। তাহার উত্তর এই যে" (প্রত্যপকার হইতে নিবৃত্ত-) আমার (ক্ষমাগুণান্বিত) চিত্তের মাহাত্ম্যবশত আমি যদি নরকে না যাই, আমি যদি নিজেকে রক্ষা করি, তাহাতে ইহাদের কী আসিয়া যায় ॥৫০॥

"আমি নিজেকে এইভাবে (ক্ষমাগুণের দ্বারা) রক্ষা না করিয়া" যদি প্রত্যপকার করি, তথাপি ইহাদের রক্ষা করা যায় না। উপরন্তু আমার বোধিচর্যা নষ্ট হয়। অতএব, কোনো-প্রকারেই এই হতভাগ্যগণের রক্ষা নাই। ইহারা বিনষ্ট হইবে ॥৫১॥

মন অমূর্ত। সুতরাং কেহ কখনো তাহাকে আঘাত করিতে পারে না। শরীরের প্রতি আসক্তিবশতই মন দেহের দুঃখে (নিজদুঃখ কল্পনা করিয়া) দুঃখিত হয় ॥৫২॥

ধিক্কার, কর্কশবাক্য, অযশ ইত্যাদি দেহকে আঘাত করে না। (মনকে তো করিতেই পারে না—কেননা, মন অমূর্ত) তবে হে মন, কেন তুমি ক্রুদ্ধ হও ॥৫৩॥

আমার উপর লোকের যে-অসন্তোষ, ইহজন্মে অথবা পরজন্মে, সেই অসন্তোষ কি আমাকে খাইয়া ফেলিবে। তবে তাহা আমার অপ্রিয় কেন ॥৫৪॥

যদি বল, আমার লাভের ব্যঘাত-কর বলিয়া ইহা (লোকের অসন্তোষ) আমার অপ্রিয়। তাহার উত্তর এই যে, লাভ ইহলোকেই ধ্বংস হইবে। কিন্তু পাপ পরলোকেও অবশ্যই বর্তমান রহিবে ॥৫৫॥

(পরাপকারাদির দ্বারা লাভবান হইয়া) দীর্ঘকাল মিথ্যা জীবনযাপন অপেক্ষা বরং আমার অদ্যই মৃত্যু হউক। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও, সেই একই মৃত্যুদুঃখ ভোগ করিতে হইবে ॥৫৬॥

স্বপ্নে যে ব্যক্তি শত বৎসর সুখভোগ করিয়া জাগ্রত হয় এবং যে-ব্যক্তি মাত্র মুহূর্ত-কাল সুখভোগ করিয়া জাগ্রত হয়, তাহাদের উভয়েরই সুখ জাগ্রত হইলে আর ফিরিয়া আসে না। "তাহার স্মৃতিমাত্রই অবশিষ্ট থাকে"। মৃত্যুকালে দীর্ঘজীবী ও ক্ষণজীবীর অবস্থাও এইরূপ ॥৫৭-৫৮॥

বহু লভ্যবস্তু লাভ করিয়াও, দীর্ঘকাল সুখ ভোগ করিয়াও লুণ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায়, রিক্তহস্ত ও নগ্ন হইয়াই আমি গমন করিব ॥৫৯॥

যদি বল, জীবিত থাকিয়া (বিষয়াদি) লাভ করিয়া, তাহা হইতে পাপ-ক্ষয় এবং পুণ্য-সঞ্চয় করিব। "অতএব আমার সেই লাভের ব্যাঘাতকারীর উপর ক্রোধ যুক্তিযুক্ত। ইহার উত্তর এই যে, লাভের জন্য লাভের ব্যাঘাতকারীর উপর" ক্রুদ্ধ হওয়ায় (সেই ক্রোধের জন্য) তোমার পুণ্য-ক্ষয় এবং পাপই সঞ্চয় হইবে ॥৬০॥

যাহার জন্য জীবনযাপন করিতেছি, তাহাই (পুণ্যই) যদি নষ্ট হয়, তবে সেই জীবনের প্রয়োজন কী। এরূপ জীবন কেবল অকল্যাণই করিতে থাকে ॥৬১॥

যদি বল, দুর্নামকারী (নিজে অপ্রসন্ন হইয়া, সকলকে অপ্রসন্ন করিয়া) সকলকে নষ্ট করে;[১] বলিয়াই তাহার উপর তোমার ক্রোধ। তাহা হইলে পরের দুর্নামকারীর উপরই বা কেন তোমার এইরূপ ক্রোধ হয় না। "সে ও তো সকলকে এইভাবে নষ্ট করে," ॥৬২॥

১ 'মানসিক অপ্রসন্নতা যেন বা ক্রোধের খাদ্য-স্বরূপ। এই খাদ্য লাভ করিয়া সে বলবান ও দৃপ্ত হয় এবং অপ্রসন্ন ব্যক্তির বিনাশ সাধন করে।' ৬।৭-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যদি বল, পরের দুর্নামকারী বা পরের উপর অসন্তুষ্ট ব্যক্তির অসন্তোষের উৎপত্তি পরায়ত্ত। অর্থাৎ পরকে অবলম্বন করিয়া (বা নিমিত্ত করিয়া) তাহা উৎপন্ন হয়। পরই তাহাকে উৎপন্ন হইতে বাধ্য করে। তাই তুমি তাহাকে ক্ষমা কর। তাহার উত্তর এই যে তোমার নিন্দাকারীর অসন্তোষ রূপ ক্লেশের উৎপত্তিও পরায়ত্ত। "উহাও তো প্রাক্তনকর্মের[1] অধীন। তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই তো উহার উৎপত্তি। তাহারাই তো উহাকে উৎপন্ন হইতে বাধ্য করে।" তবে তোমার নিন্দাকারীর প্রতি তোমার ক্ষমা নাই কেন ॥৬৩॥

প্রতিমা, স্তূপ ও সদ্ধর্মের বিরুদ্ধবাদী, নিন্দাকারী বা ধ্বংসকারীর উপরও আমার দ্বেষ যুক্তিযুক্ত নহে। ঐ কার্যে বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বাদির কোনো দুঃখ হয় না ॥৬৪॥

[কেহই স্বাধীন নহে; সকলেই পরাধীন। প্রাক্তন কর্মই প্রত্যেককে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। উহাই প্রত্যেকের প্রতি আচরণের কারণ ও নিমিত্ত (হেতুপ্রত্যয়)। উহাই বলপূর্বক সকলকে সকল কর্ম করাইতেছে]

রক্তসম্পর্কীয় অন্যান্য আত্মীয় স্বজন, প্রিয়জন ও গুরুজনদিগের অপকারিগণকেও পূর্ববৎ 'প্রত্যয়াধীন' জানিয়া, ক্রোধ সংযত করিবে ॥৬৫॥

দেহ যাহার আছে, তাহার ব্যথাপ্রাপ্তি নিশ্চয়ই ঘটিবে। কোনো ব্যথা অচেতন সামগ্রী হইতে এবং কোনো ব্যথা সচেতন প্রাণী হইতে পাইতে হয়। ব্যথা যেথা হইতেই আসুক না কেন, ব্যথার উৎপত্তি-স্থল দেখা যাইতেছে—এই সচেতন দেহ। অর্থাৎ এই দেহ না থাকিলে ব্যথা হইত না। ইহা মনে করিয়া এই ব্যথা সহ্য করো ॥৬৬॥

কেহ বা মোহবশত অপকার করিতেছে, কেহ বা মোহমুগ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে কাহাকেই বা দোষী বলিব। আর কাহাকেই বা নির্দোষ বলিব ॥৬৭॥

তুমি যে আজ শত্রুগণকর্তৃক এইভাবে পীড়িত হইতেছ—ইহা তোমারই কৃতকর্মের ফল। কেন তুমি পূর্বে এমন কর্ম করিয়াছিলে। সমস্তই কর্মাধীন। সাধ্য কী তাহার পরিবর্তন করি[2] ॥৬৮॥

ইহা অবগত হইয়া আমি শুভকর্মে সেইভাবে প্রযত্ন করিব যাহার ফলে সমস্ত প্রাণী পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হইবে ॥৬৯॥

দহ্যমান গৃহ হইতে গৃহান্তরে গিয়া, অগ্নি যখন সেখানের তৃণকাষ্ঠাদিতে আসক্ত হয়, তখন লোকে যেমন তাহা আকর্ষণ করিয়া দূরে লইয়া যায়, সেইরূপ যাহার সঙ্গহেতু চিত্ত দ্বেষ-বহ্নিতে দগ্ধ হয়, দাহের ভয়ে, তাহাকে পুণ্যাত্মাগণের তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা উচিত ॥৭০-৭১॥

মৃত্যুদণ্ডার্হ ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র হস্তচ্ছেদের দ্বারা মুক্তি পায়, তাহা কি তাহার পক্ষে

১ ২২-২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২ ইহার আক্ষরিক অনুবাদ—"আমি এখানে অন্যথা করিবার কে

অমঙ্গলজনক। সেইরূপ মনুষ্যদুঃখের দ্বারা যদি নরক-"দুঃখ" হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা কি অকল্যাণকর ॥৭২॥

আজ এই দুঃখটুকুও যদি তুমি সহ্য করিতে না পার, তবে (সহস্রগুণে-ভয়ংকর) নারকদুঃখের কারণ, ক্রোধকে কেন নিবারণ করিতেছ না ॥৭৩॥

এই ক্রোধের জন্যই বহু সহস্রবার আমি নরকে পীড়িত হইয়াছি। "ঐ বাধা-প্রাপ্তি আমার অনর্থক হইয়াছে।" উহার দ্বারা আমি নিজের বা অপরের কাহারো কোনো স্বার্থসিদ্ধি করি নাই ॥৭৪॥

এই দুঃখ, সেই নরকদুঃখের ন্যায় (ভয়ংকর) নহে। অথচ ইহা মহাফল (সর্বজীব-হিতসুখকর বুদ্ধত্ব) উৎপন্ন করিবে। যে-দুঃখ জগতের দুঃখ হরণ করিবে, সেই দুঃখে দুঃখিত না হইয়া প্রীত হওয়াই যুক্তিযুক্ত ॥৭৫॥

গুণাধিক ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া যদি কেহ প্রীতিসুখ লাভ করে, হে চিত্ত, তুমিও কেন, তাহাকে স্তুতি করিয়া, তেমনি ভাবে হর্ষলাভ কর না। "তাহা না করিয়া, উহা শুনিয়া ঈর্ষাজ্বালায় জ্বলিতেছ কেন" ॥৭৬॥

দেখো, তোমার এই প্রীতিসুখ নিরবদ্য এবং আনন্দের উৎসস্বরূপ। এইরূপ সুখভোগ (শাস্ত্রজ্ঞ) গুণিগণ-কর্তৃক নিষিদ্ধ হয় নাই। অপরকে আকৃষ্ট করিবারও ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ॥৭৭॥

উহা (যে গুণাধিক-ব্যক্তির স্তুতি করিতেছে) তাহারই সুখ, এই মনে করিয়া যদি উহা তোমার প্রিয় না হয়, তাহা হইলে মূল্যদান ও প্রতিদানাদি বিষয়েও তোমাকে বিরত হইতে হয়। "কেননা উহার দ্বারাও যাহাকে উহা দেওয়া হয়, তাহার সুখ উৎপন্ন হয়।

যে অন্যের সুখ সহ্য করিতে পারে না, তাহার পক্ষে ভৃত্যাদির বেতন দেওয়া এবং উপকারীর প্রত্যুপকার করাও সম্ভব নহে।" এরূপ করিলে তোমার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে ॥৭৮॥

তোমার গুণকীর্তনের দ্বারা অন্যের সুখ হউক—ইহা তুমি চাও, কিন্তু অন্যের গুণকীর্তনের দ্বারা তোমার সুখ হউক—ইহা তুমি চাও না ॥৭৯॥

সর্বজীবের সুখাকাঙ্ক্ষায় বোধিচিত্ত উৎপন্ন করিয়া, স্বতঃপ্রাপ্ত সুখে সুখী সত্ত্বগণের উপর আজ কেন তুমি (ঈর্ষায়) ক্রুদ্ধ হইতেছ ॥৮০॥

তুমি নাকি সমস্ত প্রাণীর ত্রৈলোক্যপূজ্য বুদ্ধত্ব কামনা কর। তবে তাহাদের নশ্বর সম্মান দেখিয়া কিজন্য ঈর্ষায় দগ্ধ হইতেছ ॥৮১॥

"তুমি বোধিচিত্ত উৎপন্ন করিতে চাও। সুতরাং, সন্তানের ন্যায় সমস্ত প্রাণী তোমার পোষ্য।" যাহারা তোমার পোষ্য, তাহাদের যে পোষণ করে, (সেই কার্যের দ্বারা) তোমাকেই

সে সাহায্যদান করে। এইভাবে যে তোমার পোষ্য কুটুম্বকে পালন করিতেছে, তাহাকে লাভ করিয়া তুমি হৃষ্ট না হইয়া কিনা রুষ্ট হইতেছ ॥৮২॥

যে সত্ত্বগণের বোধি আকাঙ্ক্ষা করে, সে তাহাদের কী না চায়। যে অন্যের সম্পদে ক্রুদ্ধ হয়, তাহার বোধিচিত্ত কোথা হইতে হইবে ॥৮৩॥

"অপরের দানপ্রাপ্তিতে তোমার ঈর্ষা হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখো দেখি, সে যে দান পাইয়াছে", তাহা যদি সে না পাইত, তাহা হইলে সেই দানসামগ্রী তো দাতার গৃহেই রহিয়া যাইত। কোনো রকমেই সে তো তোমার প্রাপ্য নহে। সুতরাং দাতা তাহা তাহাকে দিল বা না দিল, তাহাতে তোমার কী ॥৮৪॥

"পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যহেতু এবং গুণহেতু, লোকে দানসম্মানাদি লাভ করে; তুমি তাহাতে ঈর্ষায় ক্রুদ্ধ হও কেন।" সে কি তাহার (ফলদানোন্মুখ) পুণ্যকে নিবারণ করিবে (তাহা কি সম্ভব)। না নিজের গুণসমূহকে নিবৃত্ত করিবে। অথবা তাহার প্রতি প্রসন্ন (দানসম্মানাদির দায়ক-) জনগণকে নিবারণ করিবে। কিংবা প্রাপ্য বস্তু লভ্যমান হইয়াও সে লইবে না। (দাতাকে নিবৃত্ত করিলে, বা প্রাপ্য বস্তু সে না লইলেই বা তোমার লাভ কী, উহা তো তোমার নিকট আসিবে না)। বলো, কী করিলে তুমি ক্রুদ্ধ হইবে না ॥৮৫॥

"তোমার যে আকাঙ্ক্ষার ব্যাঘাত হয়; তুমি যে পদে পদে হতাশার দুঃখ পাও, তাহা তোমার পূর্বজন্মকৃত পাপের ফল।"

নিজে পাপ করিয়াছ, তাহার জন্য তোমার অনুশোচনা নাই, উপরন্তু যাঁহারা পুণ্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাও॥৮৬॥

তুমি শত্রুর অনিষ্ট চাও। তাহার না হয় অনিষ্ট হইল; কিন্তু তাহাতে তোমার কী হইল। তোমার তাহাতে কী তৃপ্তি। আর, তুমি ইচ্ছা করিলেই কি তাহার অনিষ্ট হইয়া যাইবে। অহেতুক তাহা হইবে কী প্রকারে॥৮৭॥

না হয় ধরা গেল, তোমার ইচ্ছাতেই তাহার অনিষ্ট হইল। কিন্তু তাহার দুঃখ হইলে কি তোমার সুখ হইবে।

এইরূপ হওয়াকে যদি অর্থসিদ্ধি বল, তাহা হইলে অনর্থ বলিবে কাহাকে। অনর্থ বলিয়া কি ইহার উপর আর কিছু আছে॥৮৮॥

মনে রেখো, ইহাই (অর্থাৎ এইরূপ পরানিষ্ট-চিন্তন) সেই ভয়ংকর বড়িশ, যাহা ক্লেশ-বাড়িশিক (মৎসশিকারী—তোমাকে গাঁথিবার জন্য) ফেলিয়া রাখিয়াছে। (তুমি ধরা পড়িলে) উহার নিকট হইতে নরক-পালগণ তোমাকে ক্রয় করিয়া, কুম্ভিপাকে পাক করিবে ॥৮৯॥

পুণ্য, আয়ু, বল, আরোগ্যতা ও দৈহিক সুখ—এই পঞ্চপ্রকার স্বার্থই বুদ্ধিমান স্বার্থজ্ঞ ব্যক্তির অভিপ্রেত।

স্তুতি, যশ ও সম্মানে (মানুষের কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হয়,) পুণ্যও হয় না। আয়ুবৃদ্ধি বা বলবৃদ্ধিও হয় না। আরোগ্যতালাভও হয় না। দৈহিক সুখলাভও হয় না।

"ইহাতে কিঞ্চিৎ মানসিক সুখ লাভ হইতে পারে।" মানসিক সুখলাভের জন্য তাহা হইলে দ্যূতক্রীড়াও করিতে হয়, এবং মদ্যাদিও সেবন করিতে হয়।

"মানসিক সুখলাভের উপায় হইলেও, মূর্খ ও অধমজনের আনন্দদায়ক, মদ্যাদি যেমন আমরা অবৈধ ও অহিত বলিয়া পরিত্যাগ করি, স্তুতি, যশ ও সম্মানও ঠিক সেইভাবে ত্যাগ করিতে হইবে।"৯০-৯১॥

অনেকে যশের জন্য (জলের মতো) অর্থদান করে। এমন কি (রণক্ষেত্রে) প্রাণদান করে। স্তুতিবাচক শব্দগুলি লইয়া করিবে কী। মরিবে পর যশোগাথা শ্রবণ করিয়া সুখলাভ করিবে কে॥৯২॥

শিশু যেমন তাহার বালুর গৃহ ভগ্ন দেখিয়া আর্তস্বরে রোদন করে, স্তুতি ও যশোহানিতে, আমার চিত্তের অবস্থাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে॥৯৩॥

শব্দ অচেতন, সুতরাং শব্দ আমাকে স্তুতি করিতেছে—ইহা সম্ভব নহে।

"যদি বল (শব্দ নহে)" অন্য (সচেতন) ব্যক্তি আমার প্রতি প্রীত হইয়াছে, ইহাই আমার প্রীতির কারণ॥৯৪॥

অন্য ব্যক্তি আমার প্রতি প্রীত হইয়াছে, এই পরকীয়া প্রীতিতে আমার কী হয়। সেই প্রীতিসুখ তো তাহারই। তাহাতে তো আমার কিছুমাত্র ভাগ নাই॥৯৫॥

'তাহার সুখে আমার সুখ হয়'—ইহাই যদি আমার মনোভাব, তাহা হইলে সর্বত্রই আমার এরূপ সুখ হউক।

অন্যের প্রতি প্রীত হইয়া (তাহার প্রশংসা করিয়া) কেহ সুখী হইলে, তাহার সুখে তবে কেন 'আমার সুখ হয় না' ॥৯৬॥

তাহার নিকট হইতে আমি প্রশংসিত হইয়াছি, ইহাতেই আমার নিজের মধ্যে প্রীতি উৎপন্ন হইতেছে (তাহার সুখে আমার সুখ হয় নাই)। এরূপ সম্বন্ধহীন অসংলগ্ন প্রীতি-প্রাপ্তি নিতান্তই বালসুলভ॥৯৭॥

স্তুতি ও সম্মানাদি আমার কল্যাণ নষ্ট করে। সংবেগ[২] ধ্বংস করে। গুণিগণের প্রতি মাৎসর্য সৃষ্টি করে। "আমার গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক, আমারই সকল সম্পদ পাওয়া উচিত, এই মনোভাব সৃষ্টি করিয়া" অন্যের সম্পদে (ঈর্ষা,) ক্রোধ উৎপাদন করে॥৯৮॥

অতএব, আমার স্তুতিসম্মানাদির ব্যাঘাতের জন্য যাহারা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা আমাকে (নরকাদি-) অপায়-পতন হইতে পরিত্রাণ করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছে॥৯৯॥

১ ৭৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২ সংবেগ—'(১) বৈরাগ্য (২) পারমার্থিক অভীষ্টসিদ্ধির উপায়ানুষ্ঠানে ক্ষিপ্রতা (৩) বিষয়ে অনাসক্তি ও ধর্মতৎপরতা। বিষয়াসক্তি হইতে উদ্ধারলাভ করিবার জন্য এবং ধর্মসাধনের জন্য উদ্বেগ ও ত্বরা।' স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য-সম্পাদিত পাতঞ্জল-দর্শন, ১।২১ দ্রষ্টব্য।

আমি মুক্তিকামী। লাভ ও সম্মানাদির বন্ধন আমার যোগ্য নহে। যাঁহারা আমাকে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর আমার দ্বেষ উৎপন্ন হয় কিরূপে ॥১০০॥

দুঃখে প্রবেশকামী আমার সম্মুখে তাঁহারা রুদ্ধকপাটরূপে (বাধা হইয়া) দণ্ডায়মান হইলেন। উহা যেন বুদ্ধের আশীর্বাদবশতই হইল। (এইরূপ উপকারী যাঁহারা) তাঁহাদের উপর আমার দ্বেষ হয় কিরূপে ॥১০১॥

'ইহার দ্বারা আমার পুণ্যের বিঘ্ন হইল'—এইরূপ মনে করিয়াও এখানে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। ক্ষমার সমান পুণ্য নাই। সেই পুণ্যই তো এই উপস্থিত হইয়াছে ॥১০২॥

অসহিষ্ণু আমি যদি নিজের দোষে এখানে ক্ষমা না করি, তবে, পুণ্যের কারণ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও "পুণ্য অর্জন না করায়" আমার দ্বারাই এস্থলে পুণ্যের বিঘ্ন হইল ॥১০৩॥

যাহা বিনা যাহা হয় না, এবং যাহা থাকিলেই যাহা হয়, তাহাই (পূর্বোক্তই) তাহার (শেষোক্তের) কারণ। তাহাকে বিঘ্ন বলা যায় কিরূপে ॥১০৪॥

যথাসময়ে, (দাতার নিকট) যাচক উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা কি দানবিঘ্ন হয়। না (প্রব্রজ্যাকামীর নিকট) পরিব্রাজক উপস্থিত হইলে প্রব্রজ্যা-বিঘ্ন হয় ॥১০৫॥

"তাহা হইলে ক্ষমারূপ-মহাপুণ্যের কারণ অপরাধী উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা পুণ্যের বিঘ্ন হইল, এমন কথা কেমন করিয়া বলি।

দানেচ্ছু ব্যক্তির যাচকের অভাব হয় না।" যাচক সংসারে সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু অনপরাধ, আমার অপকারী পাওয়াই দুর্লভ ॥১০৬॥

সেই দুর্লভ বস্তু অ-শ্রমোপার্জিত নিধির ন্যায় স্বগৃহে আবির্ভূত হইয়াছে। বোধিচর্যার সহায়হেতু রিপু আমার আকাঙ্ক্ষার ধন ॥১০৭॥

তাঁহার ও আমার এই উভয়ের দ্বারা এই ক্ষমা-(রূপ পুণ্যের) ফল অর্জিত হইয়াছে। অতএব "ইহার ভাগ" তাঁহাকেই প্রথমে দেওয়া উচিত। কারণ তিনিই এই পুণ্যার্জনের প্রথম কারণ। "প্রধান সাহায্যকারী" ॥১০৮॥

যদি কেহ বলেন, ক্ষমাসিদ্ধির "দ্বারা আমার পুণ্যার্জন হউক—এরূপ" অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। অতএব (পুণ্যকর্মের নিমিত্ত হইলেও) শত্রু পূজ্য নহেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যে-সদ্ধর্ম আমাদের সর্বসিদ্ধির মূল, তাহাও তো অচিত্ত—"অভিপ্রায় শূন্য", তাঁহার পূজা তবে আমরা করি কেন ॥১০৯॥

"ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন, সদ্ধর্ম অচিত্ত বা (সদসদ্) অভিপ্রায়শূন্য, ইহা ঠিক, কিন্তু শত্রু তো ঠিক তাহা নহে" তাহার যে অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে। সেজন্য সে পূজিত হয় না।

"ইহার উত্তর এই যে, অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়াই তো শত্রু ক্ষমাসিদ্ধির কারণ।"

অপকারের অভিপ্রায় না লইয়া, যদি বৈদ্যের মতো তিনি আমার হিতচেষ্টা করিতেন, তবে "কি তাঁহার উপর আমার দ্বেষের সম্ভাবনাই থাকিত, না ক্ষমার প্রসঙ্গ উঠিত।" আমার ক্ষমাসিদ্ধি হইত কিরূপে ॥১১০॥

তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়াই আমার ক্ষমা উৎপন্ন হয়। অতএব তিনিই ক্ষমার কারণ। সদ্ধর্মের ন্যায়— তিনিও আমার পূজনীয় ॥১১১॥

সেইজন্যই শাক্যমুনি বলিয়াছেন—'জীবগণ এবং বুদ্ধগণ (পুণ্যক্ষেত্র বা) সিদ্ধিক্ষেত্র।'

ইহাদের আরাধনা করিয়া বহুব্যক্তি (লৌকিক ও লোকোত্তর) সর্বসম্পদ লাভ করিয়াছেন ॥১১২॥

বুদ্ধধর্ম (দশবল, মহামৈত্রী, মহাকরুণা ইত্যাদি)-প্রাপ্তি যেমন বুদ্ধগণ হইতে হয়, সেইরূপ জীবগণ হইতেও হয়। উভয়ত্র সমভাবেই উহা প্রাপ্তি হয়। অতএব ইহার জন্য বুদ্ধগণের যেরূপ আদর ও সম্মান, জীবগণেরও সেইরূপ আদর ও সম্মান হওয়া উচিত। তাহাদের সেইরূপ সম্মান হইবে না—ইহা কিরূপ যুক্তি ॥১১৩॥

কেবল অভিপ্রায়-মাত্রের কোনো মাহাত্ম্য নাই। অভিপ্রায়ের মাহাত্ম্য তাহার উপযোগী কার্য হইতে। সেই অভিপ্রায়োপযোগী কার্য জিনগণ ও জীবগণকে অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হয়। ইঁহারা উভয়েই ঐ কার্যসিদ্ধির হেতু। সেইজন্য ইঁহাদের উভয়ের মাহাত্ম্য সমান। এইদিক হইতেই জীবগণ জিনগণের সমান ॥১১৪॥

দেখো, মৈত্রীচিত্তসম্পন্ন ব্যক্তি যে-পূজা পান, উহা জীবগণেরই মাহাত্ম্য (কেননা, জীবগণকে অবলম্বন করিয়াই মৈত্রী উৎপন্ন হয়)। বুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া (নিজ চিত্ত পবিত্র করত) যে-পুণ্য অর্জিত হয় (এবং তাহার জন্য যে-পূজা পাওয়া যায়) তাহাও বুদ্ধেরই মাহাত্ম্য॥১১৫॥

বুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া যেমন বুদ্ধধর্মসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, জীবগণকে অবলম্বন করিয়াও সেইরূপ বুদ্ধধর্মসমূহ লাভ করা যায়। সুতরাং এই বুদ্ধধর্ম-প্রাপ্তির দিক হইতে (অর্থাৎ এই এক অংশে) জীবগণ জিনগণের সমান।

বস্তুত কিন্তু বুদ্ধগণের সমান কেহই নাই। কেননা—এই গুণার্ণবগণের গুণরাশির প্রতি-গুণেরই সীমা নাই ॥১১৬॥

বুদ্ধগণ শ্রেষ্ঠতম গুণরাশির স্তূপস্বরূপ। বুদ্ধগণের এই গুণরাশির কণামাত্রও যাঁহার মধ্যে দৃষ্ট হয়, ত্রৈলোক্যজাত সমস্ত বস্তুও তাঁহার পূজার যোগ্য (উপকরণ) নহে ॥১১৭॥

বুদ্ধধর্ম বা বুদ্ধত্ব যাহা হইতে উদিত হয় এমন এক শ্রেষ্ঠ শক্তিকণা, সমস্ত জীবের মধ্যেই রহিয়াছে। এই শক্তিকণা অনুযায়ী জীব-পূজা করা হইয়া থাকে।১১৮॥

জীবসেবা ভিন্ন, এই অকৃত্রিম বন্ধু অপরিমেয় উপকারি (বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব)-গণের ঋণ আর কী ভাবে পরিশোধ হইবে[1] ॥১১৯॥

যে-জীবের জন্য বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বগণ নিজ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দান করেন, যাহাদের উদ্ধারের জন্য নরকে প্রবেশ করেন, তাহাদের জন্য যাহা করিবে তাহাই সার্থক হইবে।

অতএব এই জীবগণ মহাপকারী হইলেও ইহাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ বিধান করিবে ॥১২০॥

যাহাদের জন্য আমার প্রভুগণই নিরাসক্ত হইয়া নিজ দেহ ও প্রাণ পরিত্যাগ করেন, "তাহাদের প্রত্যেকেই আমার প্রভু।" আমার প্রভু সেই জীবগণের প্রতি আমি দাসভাব না আনিয়া মান করিব কিরূপে ॥১২১॥

যাহাদের সুখে মুনীন্দ্র বুদ্ধগণ সুখী হন, যাহাদের ব্যথাতে তাঁহারা ব্যথিত হন, সেই জীবগণের সন্তোষেই তাঁহাদের সন্তোষ। তাহাদের অপকারেই তাঁহাদের অপকার ॥১২২॥

চতুর্দিক হইতে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিলে, সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু লাভ করিয়াও যেমন মন প্রফুল্ল হয় না, জীবগণ ব্যথা পাইলে, সেইরূপ, কোনো উপায়েই দয়াময়গণের প্রীতি উৎপাদন করা যায় না ॥১২৩॥

অতএব, জনদুঃখদায়ী আমি (জনদুঃখের দ্বারা) মহাকারুণিকগণকে যে-দুঃখ দিয়াছি, আজ আমি সেই পাপ (তাঁহাদের নিকট) প্রকাশ করিতেছি। হে (জনদুঃখে) দুঃখিত মুনিগণ, উহা ক্ষমা করুন ॥১২৪॥

তথাগতগণের আরাধনার জন্য আজ আমি কায়মনোবাক্যে সর্বলোকের দাস্য স্বীকার করিতেছি। সমস্ত জনগণ আমার মস্তকে চরণ স্থাপন করুক। অথবা তাহারা আমাকে হত্যা করুক। লোকনাথ, ভগবান সন্তোষ লাভ করুন ॥১২৫॥

সেই দয়াত্মাগণ এই সমস্ত জগতকে আপন আত্মায় পরিণত করিয়াছেন—এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বুদ্ধগণই এই জীবরূপে বিরাজমান। ইঁহাদের অনাদর করি কিরূপে ॥১২৬॥

ইহাই (জীবসেবাই) তথাগতগণের আরাধনা।[2] ইহাই স্বার্থসিদ্ধি (বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি)। ইহাই জগতের দুঃখহানিকর। অতএব ইহাই আমার ব্রত হউক ॥১২৭॥

দেখো, একজনমাত্র রাজপুরুষ মহা জনতাকে মর্দন করে। সেই দীর্ঘদর্শী জনতা তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারে না। কেননা সে একাকী নহে। রাজশক্তিই তাহার শক্তি।

---

১ আক্ষরিক অনুবাদ :—'সত্ত্বারাধনা ভিন্ন, এই অকৃত্রিম বন্ধু, অপরিমেয় উপকারিগণের ঋণ পরিশোধ আর কী হইতে পারে।'

অথবা—'এই অকপট বন্ধু অপরিমেয় উপকারিগণের নিকট আমার (প্রাণিপীড়ন-রূপ) যে-অপরাধ, জীবসেবা ভিন্ন তাহার পরিশোধন আর কী হইতে পারে।'

২ তুলনীয়—ভাগবত, ৩।২৯।২১,২২,২৭।

অপকারী ব্যক্তি দুর্বল হইলেও তাহার অপকার করিবে না। কেননা, সেও একাকী নহে। কারুণিক বুদ্ধগণ এবং নরকপালগণ সেই দুর্বলের বল।

অতএব, ভৃত্যগণ যেমন অধৃষ্য চণ্ড নরপতির আরাধনা করে, জীবগণেরও তেমনিভাবে আরাধনা করিবে ॥১২৮-৩০॥

নরপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কী করিবেন। যাহা জীবগণের অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়া ভোগ করিতে হয়, সেই নরক-দুঃখ কি ক্রুদ্ধ নরপতি বিধান করিতে পারেন ॥১৩১॥

তুষ্ট হইয়াই বা নরপতি কী দান করিবেন। যাহা জীবগণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া ভোগ করা যায়, সেই বুদ্ধত্বের ন্যায় কোনো কিছু কি নরপতি দান করিতে পারেন ॥১৩২॥

ভবিষ্যদ্ বুদ্ধত্বের কথা এখন থাক্। সত্ত্বারাধনার দ্বারা ইহলোকেই যে-সৌভাগ্য, যশ, ও সুস্থিতি লাভ হয়, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ॥১৩৩॥

সন্তোষ, আরোগ্য, আনন্দ, দীর্ঘজীবন, চক্রবর্তী সম্রাটের ন্যায় বিরাট সুখ, ক্ষমাবান্ ব্যক্তি বুদ্ধত্বের পূর্বে এই জন্মমৃত্যুর মধ্যে চলিতে চলিতেই (সংসারেই) লাভ করিয়া থাকেন ॥১৩৪॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এইভাবে ক্ষমাবান্ হইয়া, বীর্যের আশ্রয় লইবে। কেননা বীর্যেই বুদ্ধত্ব অবস্থান করিতেছে। বায়ু বিনা যেমন গতি সম্ভব নহে, সেইরূপ বীর্য বিনা পুণ্যও সম্ভব নহে ॥১॥

শুভকর্মে উৎসাহকে বীর্য বলা হয়। আলস্য, কুৎসিতবিষয়ে আসক্তি, দুষ্কর বিষয় হইতে নিবৃত্তি বা অনধ্যবসায় এবং (তাহার জন্য) নিজের প্রতি অবজ্ঞা,—ইহাদিগকে বীর্যের বিপক্ষ বলা হয় ॥২॥

কার্য না করায় যে-সুখ, সেই সুখাস্বাদবশত যে-নিদ্রা (বা ঝিমুনি) এবং এই উভয়-বিষয়হেতু, জড়ের ন্যায় স্থির থাকিবার যে-অভিলাষ, তাহা হইতেই আলস্য উৎপন্ন হয়।

সংসারের দুঃখে উদ্বিগ্ন না হইলেও আলস্য জন্মায়।

সংসারের দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকায় কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। অকর্মণ্যতার সুখাস্বাদবশত নিদ্রা বা জড়ত্ব আসে, তখন স্তব্ধ নিস্পন্দরূপে অবস্থান করিবার আগ্রহ হয় ॥৩॥

ক্লেশ (রাগ, দ্বেষ, মোহাদি) যেন জালধারী মৎসজীবী; এবং জন্ম যেন তাহার জাল। তুমি সেই জন্ম-জালে প্রবিষ্ট হইয়া, ক্লেশজালিকের (ক্লেশরূপ-মৎসজীবীর) আয়ত্তে আসিয়াছ। এখনও কি বুঝিতে পারিতেছ না, যে মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করিয়াছ ॥৪॥

তোমার দলের সকলেই একে একে নিহত হইতেছে— তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না। তথাপি তুমি চণ্ডালের (অবশ্য-বধ্য) মহিষের ন্যায় নিদ্রা যাইতেছ ॥৫॥

তোমার (নিষ্কৃতির) পথ সর্বদিকেই নিরুদ্ধ হইয়াছে। যমরাজ তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এখনও তোমার ভোগে রুচি হইতেছে, নিদ্রা আসিতেছে, হর্ষ হইতেছে— কেমন করিয়া ॥৬॥

"হত্যার জন্য ব্যাধিজরারূপ-অস্ত্রাদি" সামগ্রী-সমূহে সজ্জিত হইয়া, যখন ত্বরিত-গতিতে মৃত্যু আগমন করিবেন, তখন সেই অসময়ে আলস্য ত্যাগ করিয়া করিবে কী ॥৭॥

'ইহা আমি পাইলাম না, ইহা মাত্র আরম্ভ করিয়াছিলাম— ইহা অর্ধসমাপ্ত রহিল। অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া পড়িল। হায়, আমি হত হইলাম।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, তুমি তোমার হতাশ আত্মীয়গণকে দেখিতে থাকিবে। শোকাবেগে নয়ন তাহাদের স্ফীত, অশ্রুভারাক্রান্ত, রক্তবর্ণ। একদিকে তাহাদের (এইরূপ বিষণ্ণ) মুখ, অন্যদিকে যমদূতগণের (রোষ-কর্কশ ভয়ংকর) মুখ দেখিতে দেখিতে, নিজের পাপের কথা স্মরণপূর্বক সন্তপ্ত হইতে থাকিবে। তখন নারকীয় (বীভৎস) নাদ শ্রবণ করিতে করিতে, ভয়ে পুরীষলিপ্তাঙ্গ তুমি বিহ্বল হইয়া করিবে কী ॥৮-১০॥

ক্রমে ক্রমে আহারের জন্য রক্ষিত জীবন্ত (জিয়ানো) মৎস্যের (মাগুরাদির) ন্যায় তোমার অবস্থা। এই কথা চিন্তা করিয়া, তোমার ইহলোকেই ভয় হওয়া উচিত। আর পাপ করিয়া, তীব্র নরকদুঃখ হইতেও কি তোমার ভয় হইবে না॥১১॥

সামান্য উষ্ণজলের স্পর্শেও ব্যথা পাও, এমনই সুকুমার তুমি। অথচ নারকীয় কর্ম করিয়া কী করিয়া এমন নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ॥১২॥

তুমি নিরুদ্যম, অথচ ফলের আকাঙ্ক্ষা কর। তুমি সুকুমার, অথচ বহু-দুঃখভোগী। মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াও নিজেকে অমর মনে করিতেছ। হায় দুঃখ-ক্লিষ্ট, তুমি বিনষ্ট হইলে॥১৩॥

এই মানবীয় তরণী লাভ করিয়াছ। ইহার দ্বারা দুঃখের মহানদী পার হইয়া যাও। হে মুগ্ধ মানব, এখন কি নিদ্রার সময়। এই তরণী, আর কি সহজে পাওয়া যাইবে॥১৪॥

অনন্ত আনন্দধারার উৎস, সর্বোত্তম ধর্মের আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখজনক (দেহ ও মনের অনুন্নতিকর) ক্রীড়াহাস্যপরিহাসাদিতে তুমি কেমন করিয়া হর্ষলাভ কর॥১৫॥

বল,[1] অনবসাদ, নিপুণতা, আত্মবশবর্তিতা, পরাত্মসমতা[2] ও পরাত্মপরিবর্তন,[3] ইহারাই উৎসাহ (বীর্য) বৃদ্ধি করে॥১৬॥

"আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি" আমি কিরূপে বুদ্ধত্ব লাভ করিব—ইহা ভাবিয়া অবসন্ন হইও না। উহা উচিত নহে। কারণ তথাগত সত্যবাদী। তিনি ইহা বলিয়াছেন। ইহা অসত্য হইতে পারে না॥১৭॥

যাঁহারা উৎসাহবশে, এই দুর্লভ, অনুত্তম, বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্বে দংশ (ডাঁশ), মশক, মক্ষিকা ও কৃমি ছিলেন॥১৮॥

আর আমি তো মানবজন্ম লাভ করিয়াছি। আমি হিতাহিত কী, তাহা জানিতে পারি। সর্বজ্ঞ তথাগতের (ধর্ম) নীতি, যদি আমি বিসর্জন না দিই (যদি তাহা যথাযথভাবে অনুসরণ করি), তবে আমি কি বুদ্ধত্ব লাভ করিব না॥১৯॥

"বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে, জগতের সকলের দুঃখ নিজের স্কন্ধে লইতে হইবে। নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে।"

হস্তপদাদি (-অঙ্গ ছেদন করিয়া) দান করিতে হইবে। সেইজন্য আমার ভয় হয়।

" যদি কেহ এইরূপ বলেন—তাহার উত্তর এই যে—অপেক্ষাকৃত অধিকদুঃখ নিবারণের জন্য, সকলেই স্বল্প পরিমাণ দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়।"

তাহা যদি আমি না করি, তবে বুঝিতে হইবে, আমার বিচারবুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে। আমি মূঢ়, আমার লঘু গুরু জ্ঞান নাই॥২০॥

---

১ ৩১ শ্লোক দেখুন।

২ সমদর্শন—নিজেকে ও পরকে সমান বা এক মনে করা। ৮।৯০-১০৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৩ নিজেকে পর ও পরকে আপন মনে করা। ৮।১১৩-১৮৪।

"এই পথে না গিয়া যদি ইহার বিপরীত পথে যাই, তাহা হইলে"— কোটী কোটী কল্প ব্যাপিয়া, আমি ছেদন, ভেদন, দহন, উৎপাটনাদির দুঃখ বহুবার ভোগ করিতে থাকিব—আর আমার বুদ্ধত্বলাভও হইবে না ॥২১॥

অথচ এই বুদ্ধত্ব-সাধনের দুঃখ আমার পরিমিত। ইহাকে বিদ্ধকণ্টক উদ্ধারের দুঃখের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কণ্টক-বিদ্ধজনিত দুঃখ দূরীকরণের জন্ম ঐ সামান্য দুঃখ সহ্য করিতে হয় ॥২২॥

সকল বৈদ্যই চিকিৎসা-ক্রিয়ার দ্বারা রোগীকে দুঃখ দিয়া থাকেন। ঐ দুঃখের দ্বারা তাঁহারা রোগীর রোগ দূর করেন। বহুদুঃখ দূর করিবার জন্য, এইরূপে অল্প দুঃখ সহ্য করিতেই হয় ॥২৩॥

এই সমুচিত চিকিৎসা-ক্রিয়াজনিত দুঃখও বৈদ্যবর সর্বব্যাধি-চিকিৎসক বুদ্ধ রোগীকে দেন না। মহা আতুরকেও তিনি মধুর উপচারের দ্বারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন ॥২৪॥

"এই পথের পথিককে" তিনি প্রথমে শাকাদি তুচ্ছ বস্তু-দানে প্রেরণা দেন। পরে, ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে, তিনি তাহাকে এমনভাবে তৈরী করেন (অর্থাৎ এমনভাবে অল্প হইতে, অল্লাধিক, তুচ্ছ হইতে অপেক্ষাকৃত মূল্যবান বস্তু-দানে অভ্যাস করান, যে ক্রমে ক্রমে, সেই ব্যক্তি সেই শক্তি লাভ করে) যাহাতে সে নিজের মাংস পর্যন্ত দান করিতে পারে ॥২৫॥

নিজের মাংসকেই যখন শাকের ন্যায় তুচ্ছ মনে হয়— মাংসাস্থি ত্যাগ কি তখন দুষ্কর ॥২৬॥

পাপ ত্যাগ করায় তাঁহার দৈহিক দুঃখ নাই। বিদ্যা লাভ করায় তাঁহার দৌর্মনস্য নাই। কেননা, অবিদ্যার দ্বারা মিথ্যাকে সত্য কল্পনা করিয়াই দৌর্মনস্য বা মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। এবং পাপের জন্যই দৈহিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥২৭॥

পুণ্যবশত দেহ সুখলাভ করে। পাণ্ডিত্যহেতু মন সুখী হয়। সংসারে যিনি পরার্থে দণ্ডায়মান, সেই দয়ালু ব্যক্তির দুঃখ কোথায় ॥২৮॥

প্রাক্তন পাপসমূহ ক্ষয় করিতে করিতে, সাগরসম পুণ্য অর্জন করিতে করিতে, বোধিচিত্তের শক্তিবশত এই বোধিসত্ত্বগণ, শ্রাবকগণ অপেক্ষা ত্বরিতগতিতে গমন করিতে থাকেন ॥২৯॥

সর্বক্লেশ ও শ্রমহারী 'বোধিচিত্ত-রথ' লাভ করিয়া, এইভাবে সুখ হইতে সুখের মধ্যে চলিতে চলিতে বিষণ্ণ হইবে কে ॥৩০॥

'ছন্দ', 'স্থাম', 'রতি', 'মুক্তি'—এই চারিটি হইতেছে 'বল'। কুশলাভিলাষকে 'ছন্দ' বলা হয়। আরব্ধ বিষয়ে দৃঢ়তা হইতেছে 'স্থাম'। সৎকর্মাসক্তিই হইল 'রতি'। আর সামর্থ্য না হইলে সেই সময়ের জন্ম সেই কাজ পরিত্যাগ করাকে (বা স্থগিত রাখাকে) 'মুক্তি' বলা হয়। চতুরঙ্গ বলের ন্যায় এই চারিটি 'বল' জীবগণের অর্থসিদ্ধির জন্ম প্রয়োজন।

অশুভকর্মে দুঃখপ্রাপ্তি হয়—এই ভয়ে, এবং শুভকর্ম হইতে নানারূপ মধুর ফল উৎপন্ন হয়—ইহা ভাবিতে ভাবিতে 'ছন্দ' উৎপন্ন করিবে ॥৩১॥

ছন্দ, মান (চিত্তোন্নতি) রতি, ত্যাগ (মুক্তি) এবং নৈপুণ্য, ও বশিতা (আত্মবশবর্তিতা)-শক্তির দ্বারা, এইরূপে বিপক্ষকে (আলস্যকে) উন্মূলিত করিয়া উৎসাহ (বীর্য) বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে ॥৩২॥

নিজের এবং অন্যের অপরিমেয় দোষ আমাকে নষ্ট করিতে হইবে। যে-দোষের এক একটিকে ক্ষয় করিতেই শতসহস্র কল্প অতীত হইবে, সেই দোষসমূহের ক্ষয়কার্যে আমার লেশমাত্র উৎসাহও লক্ষিত হইতেছে না।

আমার অদৃষ্টে অপরিমেয় দুঃখ রহিয়াছে। হায়, ইহা ভাবিয়া আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইতেছে না।

নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য, বহু সদ্‌গুণ আমায় অর্জন করিতে হইবে। সেই গুণ-সমূহের এক একটির অভ্যাসও শতসহস্র কল্পেও হইবে কিনা সন্দেহ। অথচ সেই গুণরাশির লেশমাত্রেরও অভ্যাস কদাচ আমি করি নাই।

যে-আশ্চর্য জন্ম কোনোরকমে লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার বৃথাই গিয়াছে ॥৩৩-৩৬॥

ভগবৎপূজার মহোৎসব-সুখ লাভ হইল না। প্রতিমা, স্তূপ, সদ্ধর্মাদির সেবা (পূজা) হইল না। বিহারাদিতে দান করি নাই। দরিদ্রের আশা পূর্ণ করি নাই। ভীরুকে অভয় দিই নাই। আর্তকে সুখী করি নাই। কেবল দুঃখদানের জন্যই জননীজঠরে কণ্টকরূপে আশ্রয় লইলাম ॥৩৭-৩৮॥

পূর্বজন্মে ধর্মাভিলাষ না থাকায়, এখন আমার এইরূপ বিপত্তি ঘটিয়াছে। ইহা জানিয়া ধর্মাভিলাষ পরিত্যাগ করিবে কে ॥৩৯॥

(শাক্য-) মুনি বলিয়াছেন—ছন্দ (কুশলাভিলাষ) সকল কুশলকর্মের মূলস্বরূপ। এবং সতত শুভাশুভ কর্মের ভবিষ্যৎ ফলচিন্তা, সেই ছন্দেরও উৎপত্তির উৎস ॥৪০॥

পাপকারিগণের নানাদুঃখ, নানা দৌর্মনস্য ও নানাপ্রকার ভয় জন্মে এবং আকাঙ্ক্ষার ব্যাঘাত হইতে থাকে ॥৪১॥

পুণ্যকারীর মনোরথ যেখানেই গমন করে, তাঁহার পুণ্যবশত, সেখানেই তাঁহার সেই মনোরথ অভীষ্ট ফলরূপ-অর্ঘ্যের দ্বারা পূজিত হয় ॥৪২॥

পাপকারীর সুখাকাঙ্ক্ষা যেখানেই গমন করে, তাহার পাপবশত, সেখানেই তাহার সেই সুখাকাঙ্ক্ষা দুঃখশস্ত্রের দ্বারা ব্যাহত হয় ॥৪৩॥

এই মহাকারুণিক পুরুষোত্তম বোধিসত্ত্বগণের জন্ম হয় কিরূপে।

বিপুল সুগন্ধবিতরণকারী, শীতল সরোরুহ-গর্ভে, ইঁহারা অবস্থান করেন। জিনগণের

মধুর বচনামৃত পান করিয়া ইহাদের দেহ পুষ্টিলাভ করে। মুনি (বুদ্ধ)-গণের করজালের (জ্ঞানরশ্মির) দ্বারা কমল প্রস্ফুটিত হইলে, পরমসুন্দর দেহ ধারণ করিয়া, ইঁহারা বহির্গত হন এবং পুণ্যবলে সুগত-সুতরূপে সুগতের সম্মুখে অবস্থান করেন।৪৪॥

(নরকে) অগ্নিতাপে দ্রবীভূত তাম্রের দ্বারা দেহ নিষিক্ত করিয়া, যমদূতগণ সমস্ত চর্ম-প্রভা নষ্ট করিয়াছে। জলন্ত অসি ও শক্তির শত শত আঘাতে মাংসসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। পাপকর্মবশত হতভাগ্য মানব আর্তনাদ করিতে করিতে, সুতপ্ত লৌহকুট্টিমে বার বার পতিত হইতেছে ॥৪৫॥

এইভাবে "শুভ ও অশুভ কর্মের ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে" চিন্তা করিতে করিতে, শ্রদ্ধাবলে শুভকর্মে অভিলাষ (ছন্দ) উৎপন্ন করিবে।

তাহার পর কর্তব্য কর্ম আরম্ভ করিয়া, "বজ্রধ্বজ-সূত্রের" বিধানানুযায়ী 'মানের' ভাবনা করিবে ॥৪৬॥

কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে, কার্য-নিষ্পাদনের উপায়সমূহের বলাবল বিচার করিয়া তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিবে। অর্থাৎ, বল থাকিলে আরম্ভ করিবে, না থাকিলে করিবে না। কারণ, আরম্ভ করিয়া বন্ধ করা অপেক্ষা অনারম্ভই শ্রেয়।৪৭॥

"দেখো কার্য আরম্ভ করিয়া পরিত্যাগ করায় বহুদোষ ঘটে।"

প্রথমত, এই অভ্যাস জন্মান্তরেও চলিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, 'ইহা করিব' বলিয়া না করায় প্রতিজ্ঞাহানির পাপ হয় এবং সেই পাপ হইতে দুঃখ বর্ধিত হইতে থাকে। তৃতীয়ত, যাহা (অর্থাৎ যে-কর্ম অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায়) পরিত্যাগ করিয়া, এই (আরব্ধ-পরিত্যক্ত-)কার্য আরম্ভ করিয়াছিলে তাহা নষ্ট হয়। চতুর্থত, (উভয়) কার্যের সময় নষ্ট হয়। পঞ্চমত, এই (আরব্ধ-পরিত্যক্ত-) কার্যও অকৃত রহিয়া যায় ॥৪৮॥

কর্মে, 'উপক্লেশে'[১] ও শক্তিতে, এই তিনটি বিষয়ে 'মান' করিবে।

'ইহা একাই আমার করা উচিত'—ইহাই কর্মবিষয়ক মান ॥৪৯॥

'এই জনসমূহ কামদ্বেষাদির (ক্লেশের) অধীন। ইহারা নিজেদের স্বার্থসাধনে সমর্থ নহে। অতএব, ইহাদের সব কিছুই আমার করা উচিত। আমি তো ইহাদের ন্যায় অসমর্থ নহি' ॥৫০॥

'কী, আমি থাকিতেও কিনা অন্যে (মলপরিষ্কারাদি) হীন কাজ করিতেছে।'

হীনকাজ বলিয়া আমি যদি মানবশত উহা না করি, তবে এরূপ মানই বরং আমার নষ্ট হউক[২] ॥৫১॥

১ ক্রোধ, ঈর্ষা, মদ, মাৎসর্য, শাঠ্য, মায়া, প্রমাদ, বিক্ষেপ, জড়ত্ব আদি চতুর্বিংশ 'উপক্লেশ'।

২ এই পর্যন্ত কর্মবিষয়ক মানের দৃষ্টান্ত। ইহার পর ৫২ হইতে ৫৯ শ্লোক পর্যন্ত 'উপক্লেশ' বিষয়ক মানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

মৃত ডুণ্ডুভকে (ঢোঁড়া সাপকে) পাইয়া কাকও গরুড় হয়। সেইরূপ মন যদি আমার দুর্বল হয়, তবে সামান্য আপদও দুঃখ দিতে থাকে ॥৫২॥

বিষাদে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির আপদ বাস্তবিকই সুলভ। আর উৎসাহসম্পন্ন (বীর্যসমন্বিত) উদ্যোগী পুরুষ মহাশক্তিমানেরও অজেয় ॥৫৩॥

অতএব, চিত্তকে দৃঢ় করিতে হইবে। সেই দৃঢ় চিত্তের দ্বারা আমি আপদেরও আপদ সৃষ্টি করিব। আপদের দ্বারা যদি আমি পরাভূত হই, তবে আমার ত্রৈলোক্য-বিজিগীষা উপহাসের বিষয় হইবে ॥৫৪॥

'জিনসিংহের সন্তান আমি। আমি সিংহশিশু। আমিই সকলকে জয় করিব। আমাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না।' অন্তরে আমার এই মান বহন করা উচিত ॥৫৫॥

যাহারা মানের অধীন—তাহারা মানী নহে। তাহারা দীন, কৃপার্হ। মানশত্রু তাহাদের বশীভূত করিয়াছে। মানী তো শত্রুর বশীভূত হয় না ॥৫৬॥

তথাকথিত মানী বা দাম্ভিক ব্যক্তি, তাহাদের মান বা দম্ভের দ্বারা বহু দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। এই মনুষ্যজন্মেও তাহারা সর্বদা নিরানন্দ থাকে। পরান্নজীবী (চাকরিজীবী), দাস, মূর্খ, কুশ, কুদর্শন, এবং সর্বত্র পরাভূত হইয়াও তাহারা মানে বা দম্ভে উদ্ধত হইয়া থাকে। এই হতভাগ্যগণও যদি মানীর মধ্যে স্থান পায়, তবে বলো দেখি—দীন কে ॥৫৭-৫৮॥

যাঁহারা মানশত্রুকে জয় করিবার জন্য মান বহন করে, তাঁহারাই মানী। তাঁহারাই বিজয়ী, তাঁহারাই বীর। শক্তিমান, প্রভাবশালী হইলেও সেই মানরিপুকে হত্যা করিয়া তাঁহারা সেই জয়ফল (বুদ্ধত্ব অবস্থার ঐশ্বর্য) জনগণকে দান করেন ॥৫৯॥

কামক্রোধাদি সংক্লেশ-বাহিনীর মধ্যে সহস্রগুণ দৃপ্ত হইবে। মৃগগণ-মধ্যে সিংহের ন্যায় ক্লেশগণের দুর্ধর্ষ হইবে ॥৬০॥

মহাদুঃখের মধ্যেও চক্ষু যেমন কদাপি জিহ্বা-গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণ করে না, সেইরূপ মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইলেও কদাপি ক্লেশগণের বশীভূত হইবে না[১] ॥৬১॥

যখন যে-কর্ম আসিয়া পড়িবে, তখন সেই কর্মেই আসক্ত হইবে। দ্যূতক্রীড়াদিতে (জয়-) ফলসুখাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ন্যায় অতৃপ্তচিত্তে সেই কর্মেতেই মত্ত থাকিবে ॥৬২॥

যদিও সকলকর্মের ফল (-সুখ) পাওয়া যায় না, তথাপি কর্মের ফলসুখের আশায় লোকে কর্ম করিতেই থাকে। "কর্ম ত্যাগ করে না।" আর কর্মেই যাহার সুখ, সে কর্মত্যাগ করিয়া, নিষ্কর্মা হইয়া সুখী হইবে কিরূপে ॥৬৩॥

পরিণাম যাহার মহাদুঃখকর সেই 'ক্ষুরের ধারের উপর মধুর ন্যায়' কামসুখ উপভোগ

১ ৬০ ও ৬১ শ্লোক শক্তিবিষয়ক মানের দৃষ্টান্ত।

করিয়াও লোকের তৃপ্তি আসে না। (বা অরুচি আসে না)। আর যাহার পরিণামও মধুর, সেই কল্যাণকর পুণ্যামৃতে লোকের তৃপ্তি আসিবে (অরুচি হইবে) কিরূপে ॥৬৪॥

অতএব, মধ্যাহ্নসন্তপ্ত করী যেমন প্রথমেই যে-সরোবর লাভ করে তাহাতেই নিমগ্ন হয়, সেইরূপ কর্মের অবসান হইলেও তাহার পরই যে-কর্ম মিলিবে তাহাতেই নিমগ্ন হইবে ॥৬৫॥

কোনো কর্ম আরম্ভ করিয়া, নিজের শক্তিক্ষয় অবগত হইলে, পুনর্বার করিবার জন্য সেই সময়ের মতো তাহা পরিত্যাগ করিবে (বা স্থগিত রাখিবে)। তাহার পর তাহা সুচারুরূপে সমাপ্ত হইলে, অপরাপর কর্মের আগ্রহে তাহা বর্জন করিবে ॥৬৬॥

ক্লেশগণের (কামাদির) প্রহার নিবারণ করিবে। এবং তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে প্রহার করিবে। মনে করিবে যেন শিক্ষিত শত্রুর সহিত তোমার খড়্গযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে ॥৬৭॥

খড়্গযুদ্ধে, খড়্গ (কদাচিৎ) হস্তচ্যুত হইলে, যেমন সভয়ে সত্বর তাহা পুনর্বার গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ 'স্মৃতি'-খড়্গ (কদাপি)চ্যুত হইলে, নরকের কথা স্মরণ করিয়া, তাহা অবিলম্বে পুনর্বার গ্রহণ করিবে ॥৬৮॥

বিষ যেমন রক্তকে আশ্রয় করিয়া শরীরে বিসর্পিত (ব্যাপ্ত) হয়, দোষও সেইরূপ ছিদ্রকে অবলম্বন করিয়া চিত্তে প্রসারিত হয় ॥৬৯॥

"রাজাজ্ঞায় দণ্ডিত ব্যক্তি" তৈলপূর্ণ-পাত্রহস্তে অসিধারী রাজপুরুষের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া—"বিন্দুমাত্র তৈলপতনে" প্রাণ যাইবে, এই ভয়ে যেমন অতি সন্তর্পণে (পিচ্ছিল পথে) চলিতে থাকে, ব্রতধারী ব্যক্তিও ঠিক সেইরূপ সাবধানী হইবে ॥৭০॥

অতএব, ক্রোড়ে সর্প দেখিলে যেমন লোকে তড়িৎগতিতে দণ্ডায়মান হয়, নিদ্রা ও আলস্য আসিলে ঠিক সেইরূপ তড়িৎগতিতে তাহার প্রতিবিধান করিবে ॥৭১॥

'কিভাবে আমি ইহার প্রতিবিধান করিব, কী করিলে আমার ইহা পুনরায় না হয়,'—প্রতিস্খলনে, অত্যন্ত পরিতাপের সহিত এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিবে ॥৭২॥

তখন, ইহার জন্য, শাস্ত্রজ্ঞ সচ্চরিত্র ব্যক্তির সঙ্গ কামনা করিবে। অথবা তাঁহাদের দ্বারা বিহিত "আপদুদ্ধারক" কর্ম (প্রায়শ্চিত্তাদি)-গ্রহণে অভিলাষী হইবে ॥৭৩॥

অপ্রমাদের বিষয় সতত স্মরণে রাখিয়া, "উৎসাহবলে" নিজেকে সেইভাবে আয়ত্ত ও লঘুগতি করিয়া লইবে, যাহাতে কার্য উপস্থিত হইবার পূর্বেই তুমি সর্বত্র প্রস্তুত হইয়া থাক ॥৭৪॥

তুলা যেমন বায়ুর বশীভূত হইয়া, বায়ুর গতি অনুযায়ীই গমনাগমন করে, তুমিও সেইভাবেই উৎসাহের (বীর্যের) বশীভূত হও। সেইভাবেই (আকাশগমনাদি) ঋদ্ধিও তোমার অধিগত হইবে ॥৭৫॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এইভাবে উৎসাহ (বীর্য) বর্ধিত করিয়া, চিত্তকে সমাধিতে (একাগ্রতায়) নিবিষ্ট করিবে। বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তি ক্লেশদানবের দংষ্ট্রার মধ্যে অবস্থান করে ॥১॥

'কায়বিবেক' (জনসংপর্কবর্জন) ও 'চিত্তবিবেকের' (কামাদি-বিতর্কবর্জনের) দ্বারা বিক্ষেপের সম্ভাবনা দূর হয়। অতএব (আত্মীয়-স্বজনাদি) জনসমূহ বর্জন করিয়া, বিতর্ক (চিত্তবিক্ষেপের হেতু)-সমূহ পরিত্যাগ করিবে ॥২॥

স্নেহবশত আত্মীয়-স্বজনাদি জনসমূহ পরিত্যাগ করা যায় না। লাভসম্মানাদির আসক্তিবশতও উহা (জনসমাজ) বর্জন সম্ভব হয় না। অতএব উহা পরিত্যাগের জন্য বিদ্বান ব্যক্তি এইরূপ ভাবনা করিবেন ॥৩॥

[চিত্তের একাগ্রতালক্ষণসমন্বিত যে-সমাধি তাহাকে 'শমথ' বলা হয়। এবং তত্ত্বকে যথাযথরূপে যাহার দ্বারা জানা যায়—সেই প্রজ্ঞাকে 'বিপশ্যনা' বলা হয়। এই 'শমথ' ও 'বিপশ্যনা'যুক্ত হইয়া ক্লেশকে বিনষ্ট করা যায়। ইহা অবগত হইয়া প্রথমেই 'শমথ' উৎপন্ন করিবে।
জনসমূহের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইলে 'শমথ' উৎপন্ন হয় ॥৪॥]

যাহাকে প্রিয় বলি, সহস্রজন্মেও তাহাকে আর দেখিতে পাইব না। অতএব, কোনো অনিত্য ব্যক্তির কি কোনো অনিত্য বস্তুতে স্নেহ হওয়া উচিত ॥৫॥

প্রিয়জনকে না দেখিলে চিত্তে অসন্তোষ বা অধৈর্য উপস্থিত হয়। সেজন্য উহা একাগ্র থাকিতে পারে না। আবার প্রিয়জনকে দেখিয়াও তৃপ্তি আসে না। আসক্তি পূর্ববৎ (অদর্শনকালের ন্যায়) চিত্তকে পীড়িত করিতে থাকে ॥৬॥

প্রিয়জনের দোষগুণ কেহ যথাযথরূপে দেখিতে বা জানিতে পারে না। "তাহাদের প্রতি মোহবশত" বৈরাগ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। তাহাদের বিচ্ছেদেও লোকে দগ্ধ হয়, আবার তাহাদের মিলনাকাঙ্ক্ষাতেও (পুনঃ পুনঃ অধিকতর মিলনাকাঙ্ক্ষায়) লোকে দগ্ধ হইতে থাকে ॥৭॥

প্রিয়জনের চিন্তাতেই আয়ু বৃথাই মুহূর্তে মুহূর্তে সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। এইভাবে অশাশ্বত মিত্রের জন্য শাশ্বত ধর্ম নষ্ট হইতেছে ॥৮॥

প্রাকৃতজনের সহিত মিলনে কী লাভ হয়। তাহাদের ন্যায় আচরণ করিলে দুর্গতি-লাভ নিশ্চিত। আবার তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহাদের অপ্রিয় হইতে হয়।
"এরূপ অবস্থায় তাহাদের সহিত সংগত না হওয়াই যুক্তিযুক্ত" ॥৯॥

মুহূর্তেই তাহারা সুহৃদ্ হয়, আবার মুহূর্তেই তাহারা শত্রু হইয়া যায়। যেখানে সন্তুষ্ট হইবার কথা, সেখানে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রাকৃতজন দুরারাধ্য ॥১০॥

হিতকথা বলিলে তাহারা কুপিত হয় এবং আমাকেও হিত হইতে নিবারণ করে। যদি

তাহাদের কথা না শোনা যায়, তাহা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা দুর্গতি (নরকাদি) প্রাপ্ত হয় ॥১১॥

উৎকৃষ্টের প্রতি ঈর্ষা, সমানের সহিত দ্বন্দ্ব, হীনের নিকট মানাকাঙ্ক্ষা—ইহাই প্রাকৃত-জনের ধর্ম। কেহ স্তুতি করিলে তাহাদের মত্ততা জন্মে। কেহ তাহাদের দোষের কথা কহিলে তাহাদের দ্বেষ উৎপন্ন হয়। এইরূপ প্রাকৃতজন হইতে কি কখনো হিতলাভ হয় ॥১২॥

আত্মশ্লাঘা, পরনিন্দা, এবং সংসারের ভোগসুখের বর্ণনা, এইরূপ কোনো কিছু দোষ, প্রাকৃতজনগণের, একের অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্তি হয় ॥১৩॥

আবার তাহার সঙ্গহেতু অন্যব্যক্তির মধ্যেও সেই দোষ আসে। অতএব, অনর্থ-সংপ্রাপ্তিই হইতেছে—প্রাকৃতজন-সমাগমের ফল ॥১৪॥

প্রাকৃতজন হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। যদি দৈবক্রমে তাহার সহিত মিলন হয়, তবে তাহার প্রিয় উপচারের দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে। তাহা কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভিপ্রায়ে করিবে না। কিন্তু সদাচারসম্পন্ন উদাসীন ব্যক্তির ন্যায় তাহা করিবে ॥১৫॥

ভৃঙ্গগণ যেমন কুসুম হইতে মধু আহরণ করে, সেইভাবে, ধর্মের জন্য যাহা প্রয়োজন, কেবলমাত্র তাহাই আহরণ করিয়া, সর্বত্র পূর্বে-অ-দৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অপরিচিতভাবে বিচরণ করিবে ॥১৬॥

'আমি সম্পৎ-প্রাপ্ত (লাভী), জনগণকর্তৃক সম্পূজিত, আমি বহুব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা-ভাজন,আমাকে তাহাদের প্রয়োজন'—ইহা মনে করিয়া উপস্থিত মরণ হইতে মানুষের ত্রাস জন্মে ॥১৭॥

সুখবিমুগ্ধ চিত্তের যাহাতে যাহাতে আসক্তি হয়, তাহাই সহস্রগুণ দুঃখ হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয় ॥১৮॥

অতএব প্রাজ্ঞজন এই বিষয়াসক্তি আকাঙ্ক্ষা করিবে না। বিষয়াসক্তির আকাঙ্ক্ষা হইতে ভীতির উৎপত্তি।

বিষয়াসক্তির ভয় উপস্থিত হইলে, 'উহা আপনি চলিয়া যাইবে' —ইহা মনে করিয়া তাহার তিরোধান প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে ॥১৯॥

এই পৃথিবীতে লাভবান্ ও যশস্বী ব্যক্তি বহু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের লাভ ও যশের সহিত কোথায় চলিয়া গেলেন—তাহার ঠিকানা নাই ॥২০॥

আমি প্রশংসিত হইলাম বলিয়া আনন্দিত হই কেন। এই আমাকেই তো অনেকে নিন্দা করে। তেমনি আমি নিন্দিত হইলাম বলিয়াই বা দুঃখ করি কেন। এই আমাকেই তো অনেকে প্রশংসা করে ॥২১॥

প্রাকৃতজনগণের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি বিচিত্র। জিনগণও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। আর আমার মতো অজ্ঞব্যক্তি তাহা কেমন করিয়া পারিবে। সুতরাং, প্রাকৃত জনগণের চিন্তায় আমার কী প্রয়োজন ॥২২॥

যাহারা সম্পদহীন ব্যক্তির নিন্দা করে, সম্পৎশালী ব্যক্তির কুৎসা রটনা করে (বা তাহাকে অবজ্ঞা করে), যাহাদের সহবাস স্বভাবতই দুঃখজনক, এইরূপ প্রাকৃতজনের সংসর্গে হর্ষ উৎপন্ন হইবে কিরূপে ॥২৩॥

তথাগতগণ বলিয়াছেন—প্রাকৃতজন কাহারো মিত্র নহে। কেননা, স্বার্থ ব্যতীত, তাহাদের প্রীতির উদ্রেক হয় না ॥২৪ ॥

স্বার্থে যে-প্রীতির উৎপত্তি—তাহা আত্মপ্রীতি। বন্ধুবান্ধবাদি অপরের ধ্বংস-প্রাপ্তিতে প্রাকৃতজনের যে-উদ্বেগ, তাহার কারণও স্বার্থহানি। উহা তাহাদের সম্পত্তি-হানির ন্যায় ॥২৫॥

তরুগণ অবজ্ঞা করে না (বা কুৎসা রটায় না)। সযত্নে তাহাদের আরাধনা করিতে হয় না। তাহাদের সহবাস সুখকর। কবে আমার তাহাদের সহবাস লাভ হইবে ॥২৬॥

শূন্য দেবালয়ে, কিংবা বৃক্ষমূলে, অথবা গুহামধ্যে বাস করিয়া, পিছনে না তাকাইয়া, অনাসক্তচিত্তে পুনরায় অন্যত্র চলিয়া যাইব—"আমার সেই শুভদিন আসিবে" কবে ॥২৭॥

স্বভাবত বিস্তীর্ণ (চিত্ত-প্রসাদকারী), অনধিকৃত প্রদেশে, কবে আমি গৃহহীন, স্বচ্ছন্দগতি হইয়া বিচরণ করিব ॥২৮॥

আমার বিভব মাত্র মৃৎপাত্র। আমার চীবর চোরের ব্যবহারের অনুপযুক্ত। এইভাবে কবে আমি অরক্ষিতদেহে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিব ॥২৯॥

কবে আমি আমার দেহের বাসভূমি—শ্মশানে গিয়া, অন্য কংকালসমূহের সহিত আমার এই পচন-ধর্মী দেহের তুলনা করিব ॥৩০॥

আমার এই দেহই এমন পূতিগন্ধী হইবে, যে, শৃগালগণও সেই গন্ধের জন্য নিকটে আসিবে না ॥৩১॥

যখন এই একই দেহের একসঙ্গে উৎপন্ন অস্থিখণ্ডসমূহ ভিন্ন—পৃথক হইয়া যাইবে, তখন অন্য (আমা হইতে ভিন্ন) প্রিয়জনের আর কথা কী ॥৩২॥

জীব একাকী উৎপন্ন হয়, এবং একাকীই মৃত্যুকে বরণ করে। তাহার দুঃখের অংশ-মাত্রও অন্যের নহে। অতএব বিঘ্নকারক প্রিয়জনে কী প্রয়োজন ॥৩৩॥

পথে প্রস্থিত ব্যক্তি যেমন "অন্যান্য পথিকগণের সহিত ধর্মশালাদি" আবাসে আশ্রয়

নয়, সংসার (জন্মমৃত্যুর)-পথে প্রস্থিত ব্যক্তিও সেইরূপ "আত্মীয় স্বজনাদি অন্যান্য পথিকের সহিত" এই জন্মের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে[১] ॥৩৪॥

শোকাচ্ছন্ন (আত্মীয়-) জনগণের মধ্যে চারিজন (শববাহক-) পুরুষ তোমাকে ধারণ করিতেছে—এই অবস্থা আসিবার পূর্বেই বনে গমন করিবে ॥৩৫॥

"সেই তপোবনে যখন তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত হইবে :—"

সমস্ত স্নেহদ্রোহবিবর্জিত কেবল একটি শীর্ণ শরীরমাত্র তখন অবশিষ্ট রহিয়াছে। পূর্বেই (আত্মীয়স্বজনাদি) লোকসমাজে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। সুতরাং মরণকালে (আত্মীয়স্বজনের জন্য) তাহার কোনো শোক হইতেছে না। কোনো সমীপবর্তী জ্ঞাতিবন্ধুও শোকাচ্ছন্ন হইয়া তাহাকে দুঃখ দিতেছে না। চিত্ত, বুদ্ধ ও ধর্মকে স্মরণ করিতেছে, কেহই সে-চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে না ॥৩৬-৩৭॥

অতএব, নিঃসঙ্গতাই আমাকে সর্বদা অভ্যাস করিতে হইবে। ইহা সর্ব আয়াস-বর্জিত, সর্ববিক্ষেপ[২] নাশক, আনন্দ দায়ক এবং কল্যাণকর ॥৩৮॥

অন্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক নিজ ধ্যেয় বস্তুতে ('আলম্বনে') একাগ্রমনা হইয়া আমি সংযম ও সমাধির জন্য প্রযত্ন করিব ॥৩৯॥

রূপাদি ভোগ্য বিষয় ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়ত্রই অনর্থের কারণ। ইহা ইহলোকে এবং পরলোকে—নরকাদিতে, ছেদন, বন্ধন ও বধাদি বিপদ (অনর্থ) সৃষ্টি করে ॥৪০॥

যাহাদের জন্য দূত ও দূতীগণের নিকট বহুবার কৃতাঞ্জলি হইয়া অনুনয় করিয়াছিলে, যাহাদের জন্য পাপ বা কুকীর্তিকেও ভ্রূক্ষেপ কর নাই, যাহাদের জন্য বহু-অর্থ ব্যয় করিয়াছিলে, ভয়ংকর বিপদের মধ্যেও নিজেকে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, যাহাদের আলিঙ্গন করিয়া পরম সুখ লাভ করিতে—ইহারাই সেই অস্থিপুঞ্জ। (অধুনা) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন এবং স্বত্ববর্জিত। ইহাদিগকে স্বেচ্ছামত আলিঙ্গন করিয়া, আজ কেন সুখী হইতেছ না ॥৪১-৪৩॥

যত্ন করিয়া তুলিয়া ধরিলেও যে-মুখ তখনই লজ্জায় নত হইয়া পড়িত, জালিকাবৃত[৩] যে-মুখ পূর্বে তোমার কদাচিৎ নয়নগোচর হইত। হয়ত বা হইত না। তোমার "অতৃপ্তমনের" খেদ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন আজ গৃধ্রগণ সে-মুখ অপাবৃত করিয়াছে। "এবার তৃপ্তিভরে" দর্শন করো। এখন পলাইয়া যাইতেছ কেন ॥৪৪-৪৫॥

অন্যের যাহাতে নয়নগোচর না হয়, তাহার জন্য যাহাকে তুমি সর্বপ্রকারে রক্ষা করিতে,

১ তুলনীয়—বুদ্ধচরিত, ৬।৪৬-৪৮।

২ বিক্ষেপ—দৈহিক, মানসিক বা বাচসিক দুরাচার।

৩ জালিকা—সূক্ষ্মবস্ত্রের (মশারি-সদৃশ) মুখাবরণ।

সেই মুখ আজ "গৃধ্র-শৃগালগণ" ভক্ষণ করিতেছে। হে ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষ, "আজ" কেন তাহাকে রক্ষা কর না ॥৪৬॥

গৃধ্রাদির দ্বারা ভক্ষিত হইতে দেখিয়াও এই মাংসরাশি (দেহ)-কে তুমি কিনা অলংকৃত করিতেছ। মাল্যচন্দনাদির দ্বারা এযে অন্যের আহার্যসামগ্রীর তুমি পূজা করিতেছ ॥৪৭॥

দেখো, স্থির নিশ্চল কংকালমাত্র দর্শন করিয়াই তোমার ত্রাস উৎপন্ন হয়। কোনো বেতাল যখন সেই কংকালের উপর ভর করিয়া, তাহাকে চালিত করে—তখন তাহাতে (অর্থাৎ যাহাকে তুমি জীবিত শরীর বল) কি তোমার ভয় হয় না ॥৪৮॥

একই খাদ্যদ্রব্যের পানাহার হইতে লালা ও পুরীষ উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে পুরীষ তোমার প্রিয় নহে, (স্ত্রীলোকের) লালাপান তোমার প্রিয় হয় কিরূপে ॥৪৯॥

তুল-পরিপূরিত, কোমলস্পর্শ উপাধান লইয়া কামিগণ রমণ করে না। কেননা, উহা হইতে অশুচি দুর্গন্ধ বাহির হয় না। কামিগণ যে অশুচিতেই মুগ্ধ হয় ॥৫০॥

আবৃত থাকিলেও যাহাতে (যে-অশুচি বস্তুতে) তোমার আসক্তি হয়, অনাবৃত থাকিলে তাহা কেন তোমার অপ্রিয় হয়।

অশুচি বস্তুতে যদি তোমার প্রয়োজন নাই, তবে আবৃত হইলে তাহাকেই (আলিঙ্গনাদির দ্বারা) বিমর্দন কর কেন ॥৫১॥

অশুচি বস্তু যদি তোমার অপ্রিয়, তবে মাংস-কর্দম-পরিলিপ্ত কদর্য স্নায়ু-সংশ্লিষ্ট, অপরের অস্থিপঞ্জরকে তুমি আলিঙ্গন করিতেছ কেন ॥৫২॥

"যদি বল অনাবৃত অশুচি বস্তু তোমার অপ্রিয়, কিন্তু আবৃত অশুচি বস্তু তোমার প্রিয়, তাই তুমি উহা কর—তাহার উত্তর এই যে :—

এই ভাবে আবৃত" অশুচি বস্তু তো তোমার নিজেরই বহু রহিয়াছে, তাহাতেই তুমি সন্তোষ লাভ করো। হে পুরীষভক্ষণশীল, তুমি অপরা অমেধ্য ভস্ত্রাকে (অশুচির ভিস্তি স্ত্রীদেহকে) বিস্মৃত হও ॥৫৩॥

যদি বল, ইহার (এই স্ত্রীলোকের) মাংস তোমার প্রিয় বলিয়াই তুমি দেখিতে ও স্পর্শ করিতে চাও। তাহার উত্তর এই যে, মাংস তো স্বভাবত অচেতন—সেই অচেতন মাংসকে তুমি কেমন করিয়া আকাঙ্ক্ষা কর ॥৫৪॥

তুমি যাহাকে চাও, তাহা (তোমার প্রিয়া) চিৎস্বভাব, তাহার দর্শন বা স্পর্শ সম্ভব নহে। যাহা দেখা যায় বা স্পর্শ করা যায়, তাহা অচেতন—তাহার অনুভূতি নাই—কেন তুমি তাহাকে (অচেতনদেহকে) বৃথা আলিঙ্গন করিতেছ ॥৫৫॥

অন্যের দেহ অপবিত্র বস্তু-পূর্ণ, তুমি তাহা জান না—ইহা অবশ্য আশ্চর্য নহে। কিন্তু তোমার দেহ যে অপবিত্র বস্তু-পূর্ণ, তাহাও তুমি জান না—ইহাই আশ্চর্য ॥৫৬॥

মেঘনির্মুক্ত-সূর্যকিরণ-বিকশিত তরুণ শতদলকে পরিত্যাগ করিয়া, অমেধ্যাসক্ত চিত্তের মলাধারে (মলপিঞ্জরে) কী সুখলাভ হয় ॥৫৭॥

ভূমি বা বস্ত্র প্রভৃতি অশুচি বস্তুর দ্বারা লিপ্ত হইলে, তুমি তাহা স্পর্শ করিতে চাও না; তাহা (অশুচি বস্তু) যাহা হইতে নির্গত হয়, সেই (স্ত্রীদেহকে) তুমি কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে চাও ॥৫৮॥

অশুচি বস্তুতে যদি তোমার বিরক্তি, তবে অশুচি ক্ষেত্রে, অশুচি বীজ হইতে উৎপন্ন, এবং অশুচি বস্তুর দ্বারা বর্ধিত অঙ্গকে (স্ত্রীদেহকে) আলিঙ্গন করিতেছ কেন ॥৫৯॥

পুরীষাদি অমেধ্য বস্তুজাত কৃমি তোমার অবাঞ্ছনীয়। অথচ অমেধ্যজ ও বহু অমেধ্যপূর্ণ দেহকে তুমি কামনা করিতেছ ॥৬০॥

তুমি যে কেবলমাত্র তোমার নিজের অশুচিতাকে ঘৃণা করিতেছ না—তাহা নহে। হে পুরীষাশিন, তুমি অন্যের অশুচি-ভাণ্ডের জন্য (স্ত্রীদেহের জন্য) লালায়িত হইতেছ ॥৬১॥

কর্পূরাদি হৃদ্য বস্ত্র, শালিধানের অন্ন বা ব্যঞ্জনাদি, মুখ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেখানে পতিত বা পরিত্যক্ত হয়, সেই ভূমি পর্যন্ত অশুচি বলিয়া গণ্য হয় ॥৬২॥

দেহ অমেধ্য, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। তথাপি যদি তুমি তাহা বিশ্বাস না কর, তবে শ্মশানে পতিত বীভৎস অন্য কতকগুলি দেহ দর্শন করো ॥৬৩॥

চর্ম উৎপাটন করিলে, যাহা হইতে মহাভয় উৎপন্ন হয়, জানিয়া শুনিয়া তাহাতেই তোমার আসক্তি হইতেছে কিরূপে ॥৬৪॥

দেহে চন্দন লেপন করিলে যে-সুগন্ধ পাওয়া যায়, তাহা চন্দন হইতেই; দেহ হইতে নহে। একের গন্ধে তুমি অন্যে আসক্ত হও কেন ॥৬৫॥

দেহের স্বাভাবিক দুর্গন্ধবশত যদি তাহাতে আসক্তি না হয়, তবে তাহা তো কল্যাণকর। অনর্থপ্রিয় জনগণ কেন তাহাতে সুগন্ধ লেপন করিতেছে ॥৬৬॥

চন্দন সুগন্ধি। কিন্তু তাহাতে (স্বভাব-দুর্গন্ধি) দেহের কী। একের গন্ধে অন্যে আসক্ত হও কেন ॥৬৭॥

দীর্ঘ-কেশ, দীর্ঘ-নখ, মলিন বিবর্ণ দন্তরাজি এবং পঙ্কসমক্লেদধারী নগ্ন উলঙ্গ দেহ যদি স্বভাবতই ভয়ংকর—"তবে তাহা তো কল্যাণকর। তাহার সেই অকৃত্রিম রূপ দেখিলে সহজেই দৈহিক রূপের প্রতি আসক্তি দূর হইবে।"

আত্মহত্যার জন্য, অস্ত্রের ন্যায় তাহাকে সংস্কৃত (নির্মল, অলংকৃত) করিতেছ কেন। হায়, নিজেকে মোহ-মুগ্ধ করিতে উদ্যত, উন্মত্ত জনসংঘের দ্বারা এই ধরণী পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ॥৬৮-৬৯॥

কতিপয় কংকাল দেখিয়া শ্মশানে তোমার ঘৃণা হয়। আর চলমান কংকালপরিপূর্ণ গ্রামশ্মশানে তুমি আনন্দ লাভ করিতেছ ॥৭০॥

এইরূপ অশুচি হইলেও, বিনামূল্যে ইহা পাওয়া যায় না। ইহার জন্য ইহলোকে উপার্জনের শ্রমদুঃখ, এবং পরলোকে—নরকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥৭১॥

শিশুর উপার্জনসামর্থ্য নাই। অতএব (অর্থ বিনা) কিসের বলে সে যৌবনে সুখী হইবে। উপার্জন করিতে করিতে যৌবন চলিয়া যায়; বৃদ্ধ ভোগ্যবিষয় লইয়া করিবে কী॥৭২॥

কদর্য-ভোগলোলুপ কেহ কেহ সারাদিন কঠোর (শারীরিক) পরিশ্রম করিয়া, সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া মৃতবৎ নিদ্রা যায়। "এইভাবেই তাহাদের দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। ভোগ তাহারা করিবে কখন" ॥৭৩॥

কেহ বা যুদ্ধযাত্রা করিয়া প্রবাসে শ্রমকষ্টে (ও স্বজনবিরহে) পীড়িত হইতে থাকে। যাহাদের জন্য তাহারা এত কষ্ট স্বীকার করে, সেই স্ত্রীপুত্রকে তাহারা বৎসরের পর বৎসর (অথবা চিরতরে) দেখিতে পায় না ॥৭৪।

এই কামমোহিত ব্যক্তিগণ যাহার জন্য নিজেকে বিক্রীত করিল, তাহা লাভ করিল না। বৃথাই পরের কার্যে জীবন তাহাদের অতিবাহিত হইল ॥৭৫॥

পরের নিকট আত্মবিক্রীত ব্যক্তিগণ, প্রভু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া (সপরিবারে) সর্বদা যত্র তত্র গমন করিতে থাকে। তাহাদের স্ত্রীগণ বৃক্ষতলে, অরণ্যে, পর্বতে, নদীতটাদিতে, সন্তান প্রসব করে ॥৭৬।

লোকে জীবনধারণের জন্য, জীবনসংশয়াকুল যুদ্ধে গমন করে। কামবিড়ম্বিত মূর্খগণ সম্মানের জন্য দাসত্ব (চাকরি) করে ॥৭৭॥

বিষয়ভোগে লালায়িত হইয়া (নানা দুষ্কর্ম করিয়া) কাহারো হস্তাদি ছিন্ন হয়। কেহ বা শূলে সমর্পিত হয়। (পরদারাদিহরণ, দস্যুতা, বা যুদ্ধ করিতে গিয়া) কেহ বা শক্তির দ্বারা নিহত হয়। কাহাকেও বা জীবন্ত দগ্ধ হইতে দেখা যায় ॥৭৮॥

জানিয়া রাখিয়ো, অর্থে অনর্থের আর অন্ত নাই। উহা অর্জন করিতে কষ্ট হয়, উহা রক্ষা করিতে (অধিকতর) কষ্ট (এবং দুশ্চিন্তা) হয়, উহা নষ্ট হইলেও কষ্ট (ও বিষাদ উপস্থিত) হয়। ধনাসক্ত ব্যক্তির ধনোপার্জনের ব্যগ্রতায়, ভবদুঃখবিমোচনের অবসরই মিলে না ॥৭৯॥

এইরূপে বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষী জনগণের অনর্থ-প্রাপ্তিই অধিক হয়। তাহাদের সুখাস্বাদ শকটবাহী পশুর তৃণকবল গ্রহণের ন্যায় অতি সামান্যই ॥৮০॥

যাহা পশুদিগের পক্ষেও দুর্লভ নহে, সেই (তুচ্ছ) সুখাস্বাদলেশের জন্য এই অতি দুর্লভ 'ক্ষণসম্পদ' এই দৈব-বিড়ম্বিত ব্যক্তি নষ্ট করিল ॥৮১॥

নরকাদিতে পতনশীল নিয়ত নশ্বর, অতি তুচ্ছ দেহের জন্য, সৃষ্টির আদিকাল হইতে সর্বদা এই যে পরিশ্রম করা হইল, ইহার শতকোটী ভাগের একভাগ পরিশ্রম করিলেই বুদ্ধত্ব লাভ হয়।

কামি-ব্যক্তিগণের দুঃখ বোধিচর্যার দুঃখ অপেক্ষাও গুরুতর। অথচ তাহাদের সেই বোধিপ্রাপ্তি নাই ॥৮২-৮৩॥

নরকাদির ব্যথা মনে হইলে, কামের সহিত, শস্ত্র, বিষ, অগ্নি, প্রপাত, ইহাদের কাহারো তুলনা চলে না ॥৮৪॥

এইভাবে কাম্য বিষয়ে ভীত হইয়া, কলহায়াসশূন্য শান্ত বনভূমিতে, নিরাসঙ্গতার প্রতি আগ্রহ উৎপন্ন করিবে ॥৮৫॥

শব্দহীন, ধীর, সুখস্পর্শ বন-পবন কর্তৃক বীজ্যমান (সেবিত), সুকৃতকারী ব্যক্তিগণ, বিরাট হর্ম্যতলসদৃশ, চন্দনোপম-শশিকর-শীতল রম্য শিলাতলে ভ্রমণ করিতে করিতে, পরহিত-বিষয়ে (জীবগণের সুখোৎপাদনের) চিন্তা করিতে থাকেন ॥৮৬॥

তাঁহারা পরিত্যক্ত গৃহে, বৃক্ষতলে, অথবা পর্বতগুহায়, যেখানে সেখানে, যতক্ষণ ইচ্ছা কাল কাটাইয়া, লব্ধ ধনরক্ষার আয়াস হইতে মুক্ত হইয়া, অনাসক্তচিত্তে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে থাকেন ॥৮৭॥

তাঁহাদের গৃহ নাই। কাহারো নিকট কোনোরূপ বন্ধন নাই। স্বাধীন, স্বচ্ছন্দচারী, তাঁহারা যে-সন্তোষসুখ ভোগ করেন—তাহা ইন্দ্রেরও দুর্লভ ॥৮৮॥

এইভাবে বিবিধপ্রকারে, বাহ্যিক নিঃসঙ্গতা ও আন্তরিক নিরাসঙ্গতার[১] গুণ ভাবনা করিতে করিতে, বিতর্ক[২] (চিত্তবিক্ষেপ) শান্ত করিয়া, বোধিচিত্ত ভাবনা করিবে ॥৮৯॥

প্রথমত, পরম অভিনিবেশের সহিত 'পরাত্মসমতার' বিষয় এই ভাবে চিন্তা করিতে থাকিবে :—

আমার সুখ বা দুঃখ আমার মনে যে-ভাব উৎপন্ন করে, অন্যের সুখ বা দুঃখ তাহার মনে সেই ভাবই সৃষ্টি করে। অতএব, যখন সুখ দুঃখ সকলেরই সমান, তখন সকলকেই আমার নিজের ন্যায় রক্ষা করা উচিত ॥৯০॥

করচরণমস্তকাদি নানা অঙ্গভেদে বহুরূপবিশিষ্ট এই দেহকে যেমন আমাদের এক মনে করিয়া পালন করিতে হয়, সমান সুখদুঃখান্বিত জীবজগৎকেও সেইরূপ এক মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। করচরণমস্তকাদির সুখদুঃখ যেমন আমার নিকট ভিন্ন নহে—এক, সমস্ত জগতের সুখদুঃখও তেমনি ভিন্ন নহে—এক ॥৯১॥

আমার দুঃখ যেমন অন্যের দেহকে পীড়া না দিলেও তাহা দুঃখই, সেইরূপ অন্যের দুঃখ

১ ৮।২ শ্লোকোক্ত 'কায়বিবেক' ও 'চিত্তবিবেকের'।

২ অসৎ চিন্তা, অসৎ সংকল্প, যাহা চিত্তকে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র হইতে দেয় না। পালি 'বিতক্ক' (-বিচার) শব্দ হইতে এই শব্দ এখানে ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

আমার দ্বারা অনুভূত না হইলেও—উহাও দুঃখই। নিজের প্রতি স্নেহ (আসক্তি)-বশত ঐ দুঃখ যেমন আমার দুঃসহ ; উহারও তেমনি উহা দুঃসহ ॥৯২-৯৩॥

সকলের দুঃখই দুঃখ, সেইজন্যই নিজের দুঃখের ন্যায় অপরের দুঃখকেও আমার ধ্বংস করিতে হইবে।

আমি যেমন প্রাণবান—অন্য প্রাণীও সেইরূপ প্রাণবান। সেইজন্যই, নিজের ন্যায় অন্য প্রাণীকেও আমায় দয়া করিতে হইবে ॥৯৪॥

আমার নিকট আমার সুখ যেমন প্রিয়, অন্যের নিকটেও তাহার সুখ তেমনি প্রিয়। অতএব অন্য হইতে আমার প্রভেদ কোথায়, যাহাতে আমি কেবল আমার সুখের জন্যই চেষ্টা করিব ॥৯৫॥

আমার যেমন ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে, অন্যেরও সেইরূপ ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে ; অতএব অন্য হইতে আমার প্রভেদ কোথায়, যাহাতে আমি কেবল আমাকেই রক্ষা করিব, অন্যকে রক্ষা করিব না ॥৯৬॥

যদি বল, 'অন্যের দুঃখ আমাকে পীড়া দেয় না, সেইজন্যই আমি অন্যকে রক্ষা করি না'—তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, পরলোকের (আগামী জন্মের) দেহের দুঃখ তো তোমাকে পীড়া দেয় না, তথাপি সেই দুঃখ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য (পুণ্যাদি আচরণের দ্বারা) চেষ্টা কর কেন ॥৯৭॥

যদি বল 'এই আমিই তখনো রহিব', তাহার উত্তর এই যে, উহা তোমার মিথ্যা কল্পনা। ইহলোকে যাহার মৃত্যু হইতেছে এবং পরলোকে যে উৎপন্ন হইতেছে তাহারা এক ব্যক্তি নহে।

"বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষের ন্যায়, অগ্নি হইতে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায়, এই পঞ্চস্কন্ধ হইতে না এক, না অন্য, অপূর্ব এক পঞ্চস্কন্ধ[১] (পরলোকে) উৎপন্ন হয়"॥৯৮॥

---

১ পঞ্চস্কন্ধ—বৌদ্ধগণ আত্মা মানেন না। পঞ্চস্কন্ধ ভিন্ন অন্য কোনো পদার্থ বৌদ্ধগণ মানেন না। এই পঞ্চস্কন্ধ হইতেছে (১) রূপ (২) বেদনা (৩) সংজ্ঞা (৪) সংস্কার (৫) বিজ্ঞান।

(১) রূপ হইতেছে, আমাদের দেহ, তথা চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তরুলতা, তৃণপুষ্প ইত্যাদির সমষ্টি সমস্ত বাহ্য জগৎ।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই চারিটি বিষয় লইয়া অন্তর্জগৎ গঠিত হইয়াছে (এই চারিটি বিষয়কে বৌদ্ধগণ—'নাম' এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। সুতরাং 'নাম ও রূপ' বা 'নামরূপ' বলিলে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ-বিশিষ্ট সমস্ত বিশ্বজগৎ বুঝিতে হইবে)। ইহা ব্যতীত আত্মা বলিয়া আর কোনো বস্তু নাই।

(২) বেদনা হইতেছে—সুখ দুঃখাদির অনুভূতি, ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ব যাহাকে Feelings বলে।

(৩) সংজ্ঞা অর্থাৎ বোধ, প্রতীতি। ইউরোপীয় দর্শন যাহাকে Perception, Ideation বলে।

(৪) সংস্কার বলিতে বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত অন্তর্জগতের, সংকল্পাদি অন্য সমস্ত বৃত্তিকে [Volitions and other faculties] বোঝায়।

(৫) বিজ্ঞান—অর্থাৎ চেতনা বা চৈতন্য। যাহাকে ইউরোপীয় দর্শন General Consciousness বলে।

এই চেতনাকেও বৌদ্ধগণ নিত্য বলিয়া মানেন না। যদি মানিতেন, তবে উহা এবং বেদান্তের বা সাংখ্যের আত্মা বা পুরুষের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ রহিত না।

বৌদ্ধগণ এই চেতনাকে ক্ষণিক বলিয়া মানেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহা ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, এবং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। এই মুহূর্তের চেতনা এবং ইহার পরমুহূর্তের চেতনা এক নহে। আবার উহা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাও নহে। একের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই (তাহা হইতে) অপরের উৎপত্তি হইতেছে। ইহা এত দ্রুত হইতেছে যে, ইহাদের মধ্যে যে-ব্যবধান বা ফাঁক রহিয়াছে, তাহা ধরিবার উপায় নাই। প্রদীপের শিখার সঙ্গে ইহার তুলনা দেওয়া হইয়াছে। প্রতি মুহূর্তে উহা উৎপন্ন হইলেও, এত সত্বর উহা হইতেছে যে উহাকে এক অবিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হইতেছে।

যাহার দুঃখ সেই তাহা দূর করিবে, "একের দুঃখ অন্যে দূর করিবে না"—যদি ইহাই তোমার মত হয়, তবে চরণে আঘাত হইবার উপক্রম হইলে, হস্ত কেন তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হয়। চরণের দুঃখ তো হস্তের দুঃখ নহে ॥৯৯॥

"শরীরে আত্মা বলিয়া কোনো বস্তু নাই— তাহা জানা সত্ত্বেও 'শরীরে আত্মা রহিয়াছে', 'শরীর আমার'" যদি এইরূপ (মিথ্যা) অহংকারবশত উহা হয়, তবে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যাহা যুক্তিযুক্ত নহে, "সেই অহংকার বা অহংভাব" নিজের হউক বা পরের হউক, তাহা যথাসাধ্য নিবারণ করা উচিত ॥১০০॥

"যদি বল, আত্মা না থাকিলেও একটি ধারা বা প্রবাহ ('সন্তান') রহিয়াছে এবং করচরণাদি প্রতি অঙ্গ ভিন্ন হইলেও, তাহার সমষ্টিগত ঐক্য ('সমুদায়') রহিয়াছে। উহার জন্যই এক অঙ্গে আঘাতের উপক্রম হইলে, অন্য অঙ্গ তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হয়, এবং পরলোকের দুঃখের সম্ভাবনা, ইহলোকে দূর করিবার চেষ্টা হয়। ইহার উত্তর এই যে", ধারা বা প্রবাহ, বা সমষ্টিগত ঐক্য বলিয়া এক বস্তু কিছু নাই। উহা পংক্তি বা সেনার মতো[১] "ব্যবহারিক এক সংজ্ঞা মাত্র"। বাস্তবিক উহার কোনো অস্তিত্ব নাই।

"সুতরাং যখন আত্মা বা দেহী বা ধারা বা সমষ্টিগত ঐক্য বলিয়া কিছু নাই। উহা যখন পংক্তি বা সেনার ন্যায় মিথ্যা, তখন 'ইহা আমার দুঃখ', 'উহা তাহার দুঃখ' এইরূপ বলা যায় না।" যাহার দুঃখ অনুমান করা হইতেছে, সে-ই যখন নাই, তখন উহা কাহার দুঃখ বলিয়া গণ্য হইবে ॥১০১॥

সংসারে সর্বস্বত্ববর্জিত এক অভিন্ন দুঃখ রহিয়াছে। উহার অধিকারী কেহ নাই। 'আমার' 'তোমার' বলিয়া— উহার মধ্যে গণ্ডি সৃষ্টি করিতেছ কেন। দুঃখ—দুঃখ বলিয়াই নিবারণীয়। "আমার বা তোমার বলিয়া নহে" ॥১০২॥

যখন আত্মা বা দুঃখী বলিয়া কেহ নাই, তখন দুঃখ নিবারণ করিবার প্রয়োজন কী।

ইহার উত্তর এই যে, সংসারে সকলেই দুঃখ নিবারণ করিতে চায়। দুঃখ নিবারণ করিতে চায় না—এমন কেহই নাই। অর্থাৎ দুঃখনিবারণের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে সংসারে দ্বিমত নাই।

সুতরাং দুঃখ নিবারণীয়—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। আবার দুঃখ যখন নিবারণীয়, তখন সংসারের সকল দুঃখই নিবারণীয়।

১ শূন্যবাদী গ্রন্থকার এখানে 'সন্তানাদি' অন্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতেছেন :—

দূর হইতে কোনো পংক্তি বা সেনা দেখিলে মনে হয়, যেন উহার মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক নাই। উহা যেন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তো তাহা নহে। পংক্তি বা সেনার প্রত্যেকটি প্রাণী, যাহাদের লইয়া পংক্তি বা সেনা গঠিত হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। এক হইতে অন্য ভিন্ন এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। অথচ এই ভিন্ন, স্বতন্ত্র, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানযুক্ত, প্রাণিসমষ্টির পংক্তি, সেনা, ইত্যাদি ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আসলে পংক্তি বা সেনা নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নাই।

আত্মা বা দুঃখী নাই, এই যুক্তিতে যদি তুমি জগতের দুঃখনিবারণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কর ; তবে ঐ যুক্তিতেই পঞ্চস্কন্ধ-বিশিষ্ট (তথাকথিত) তোমার অস্তিত্বের দুঃখ-নিবারণের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করিতে হয় ॥১০৩॥

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মানুষের মধ্যে করুণা উৎপন্ন হইলেই তাহার দুঃখ বর্ধিত হয়। সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে, করুণাই বহু দুঃখ সৃষ্টি করে, তখন বলপূর্বক, চেষ্টা করিয়া, করুণা উৎপন্ন কর কেন।

"ইহার উত্তর এই যে, জগতে দুঃখের অন্ত নাই, নানা দুঃখের আবাসভূমি" জগতের দুঃখসমূহের বিষয় সম্যকভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, করুণাজনিত দুঃখকে কখনো অধিক বলিয়া মনে হইবে না ॥১০৪॥

তদ্ভিন্ন, একের দুঃখ সৃষ্টির দ্বারা যদি বহুর দুঃখ দূর করা যায়, তবে (সেই দুঃখ সৃষ্টি করাই যুক্তিযুক্ত) দয়ালু ব্যক্তির নিজের মধ্যে এবং অন্যের মধ্যেও এইরূপ দুঃখ সৃষ্টি করা উচিত ॥১০৫॥

সেইজন্য, বোধিসত্ত্ব সুপুষ্পচন্দ্র, রাজা হইতে তাঁহার বিপদ হইবে, ইহা স্থির জানিয়াও, "নিজের দুঃখসৃষ্টির দ্বারা বহু দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়াছিলেন।" বহু দুঃখীর দুঃখের বিনিময়ে, তিনি তাঁহার একার দুঃখ পরিহারের চেষ্টা করেন নাই ॥১০৬॥

এইরূপ যাঁহাদের চিন্তাধারা, অপরের দুঃখের জন্য নিজের সুখও যাঁহাদের নিকট দুঃখের ন্যায় ; হংস যেমন (সানন্দে) পদ্মবনে প্রবেশ করে, তাঁহারাও সেইরূপ (অন্যের দুঃখ দূরীকরণের জন্য) নরকে অবতরণ করেন ॥১০৭॥

জীবগণ যখন "দুঃখ বন্ধন হইতে" মুক্ত হইতে থাকে, তখন প্রাণে যে-আনন্দসাগরের সৃষ্টি হয়—তাহাই তো পর্যাপ্ত (যথেষ্ট)। রসহীন শুষ্ক মোক্ষে কী প্রয়োজন ॥১০৮॥

এইজন্য, পরের উপকার করিয়াও তাঁহাদের দর্প হয় না, দম্ভও হয় না। তাঁহাদের একান্ত অভিলাষই হইল পরের স্বার্থসিদ্ধি। তাই, শুভকর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের থাকে না ॥১০৯॥

অতএব, সর্বপ্রকার অনর্থ ও কলঙ্ক হইতে আমি যেমন নিজেকে রক্ষা করি, পরের প্রতিও সেইরূপ দয়া ও রক্ষার আগ্রহ অন্তরে আমার উৎপন্ন করিব ॥১১০॥

অভ্যাসের দ্বারা (যাহা আমি নহি, এমন) শুক্রশোণিতবিন্দু-আদি অন্য (বা অন্য-দীয়) বস্তুতেও, আত্মা না থাকিলেও আমার অহংজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আমি, 'আমি' বলিয়া স্বীকার করি ॥১১১॥

ইহা যদি সম্ভব হয়, তবে অন্যের দেহকেও কেন 'অহং' বা 'আমি' বলিয়া স্বীকার করি না। যাহাকে নিজদেহ বলি, উহা যে পর, তাহা তো নিশ্চিত। অতএব, পরকে আপন ভাবা তো দুষ্কর নহে ॥১১২॥

নিজেকে দোষের আকর ও পরকে গুণের সাগর মনে করিয়া আত্মত্ব পরিত্যাগে এবং পরত্ব গ্রহণে চিত্তকে প্রস্তুত করিবে ॥১১৩॥

(এই জগতেরই এক অংশ এই) দেহের অবয়বহেতু করচরণাদি যেমন তোমার অভীষ্ট বা প্রিয়, তেমনি জীবগণ কেন তোমার অভীষ্ট বা প্রিয় নহে— তাহারাও তো এই জগতের অবয়ব ॥১১৪॥

অভ্যাসবশে এই অনাত্মক নিজদেহে যেমন 'আত্মবুদ্ধি' হয়, অভ্যাসের দ্বারা পরদেহেও সেইরূপ আত্মবুদ্ধি কি হইবে না ॥১১৫॥

এইভাবে, পরসেবা করিয়াও দর্প এবং দম্ভ হয় না। কেননা, তখন উহা নিজের ভরণ-পোষণের ন্যায় স্বাভাবিক মনে হয়। ইহাতে কর্মের ফলাসক্তি বা প্রতিদানাকাঙ্ক্ষাও উৎপন্ন হয় না ॥১১৬॥

অতএব, তোমার যেমন নিজেকে দুঃখশোকাদি হইতে রক্ষা করিবার আগ্রহ হয়, সমস্ত জগতের প্রতিও অন্তরে তোমার সেইরূপ দয়া ও রক্ষার ভাব অভ্যাস করো ॥১১৭॥

এইজন্য, স্বনামখ্যাত নাথ অবলোকিতেশ্বরও জনগণের সভাভীতি বা জনতাভীতি প্রভৃতির ন্যায় অতি তুচ্ছ ভয়ও হরণ করিবার জন্য নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া (স্বর্গে) অবস্থান করিতেছেন ॥১১৮॥

দুষ্কর কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবে না। কেননা, যাহা শ্রবণ করিয়া আজ তোমার ত্রাস উৎপন্ন হইতেছে, অভ্যাসবলে এমন হইবে, যে, তাহা ভিন্ন তোমার আনন্দ হইবে না ॥১১৯॥

যিনি নিজের এবং পরের সত্বর পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার এই পরম গুহ্য "পরাত্ম-পরিবর্তন" অভ্যাস করা উচিত ॥১২০॥

যে-'আমির' প্রতি অতি স্নেহবশত নিতান্ত তুচ্ছ ভয় হইতেও বিভীষিকা উৎপন্ন হয়, সেই শত্রুসম ভয়ংকর 'আমি'র প্রতি কাহার না দ্বেষ হইবে ॥১২১॥

যে-'আমি', ব্যাধি ও ক্ষুৎপিপাসাদির প্রতীকারাকাঙ্ক্ষায় পশুপক্ষী মৎস্যাদির প্রাণনাশ করে, যে সকলের পরিপন্থী বা বিরোধী হইয়া অবস্থান করে, যে লাভসম্মানাদির জন্য মাতাপিতাকেও হত্যা করে, যে ত্রিরত্নের ধন অপহরণ করে, যে অবীচির (নরকবিশেষের) ইন্ধন হয়, সেই 'আমি'কে কোন্ বিজ্ঞব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করিবে। কে তাহাকে রক্ষা করিবে। কে তাহার অর্চনা করিবে। তাহাকে শত্রুর ন্যায় না দেখিয়া—সম্মান করিবে কে ॥১২২-১২৪॥

'যদি দিই—খাইব কী'—এইভাবে, নিজের জন্য মানুষ পিশাচ হইয়া পড়ে। 'যদি খাই—দিব কী'—এইভাবে, পরের সেবায়, মানুষ দেবাধিদেবে পরিণত হয় ॥১২৫॥

নিজের জন্য পরকে পীড়ন করিয়া, নরকাদিতে দুঃখ পাইতে হয়। আর পরের জন্য নিজেকে পীড়ন করিয়া সর্বসম্পদ লাভ হয় ॥১২৬॥

নিজের উন্নতিকামনায় আমি নিজের দুর্গতি, নীচতা ও মূর্খতা উৎপাদন করি। সেই উন্নতিকামনাই অন্যত্র সংক্রামিত করিয়া (অর্থাৎ পরের জন্য করিয়া) সুগতি, সম্মান ও সুমতি লাভ হয় ॥১২৭॥

নিজের জন্য পরকে চালনা করিয়া, দাসত্বাদি ভোগ করিবে। আর, পরের জন্য নিজেকে চালনা করিয়া, প্রভুত্বাদি উপভোগ করিবে ॥১২৮॥

এই সংসারে, যাহারা দুঃখ পাইয়া থাকে, তাহারা নিজের সুখেচ্ছাতেই দুঃখ পায়। এই সংসারে, যাহারা সুখী হইয়া থাকে, তাহারা পরের সুখাকাঙ্ক্ষাতেই সুখী হয় ॥১২৯॥

এ বিষয়ে অধিক কী বলিব। স্বার্থাকাঙ্ক্ষী প্রাকৃতজন ও পরার্থকারী মুনিজনের পার্থক্য দর্শন করো ॥১৩০॥

'অন্যের দুঃখের দ্বারা নিজের সুখ'—ইহার পরিবর্তন না করিলে (অর্থাৎ নিজের দুঃখের দ্বারা অন্যের সুখ না আনিলে), বুদ্ধত্বসিদ্ধি তো পরের কথা—এই সংসারেই বা সুখ কোথায় ॥১৩১॥

পরলোকের কথা দূরে থাক, পরার্থবুদ্ধি ভিন্ন, প্রত্যক্ষ এই জগতের কাজও অচল হইয়া যায়। ভৃত্য প্রভুর কর্ম না করিলে, এবং প্রভু ভৃত্যের বেতন না দিলে, আমাদের কার্যসিদ্ধি হয় কি ॥১৩২॥

নিজ নিজ সুখার্জন-বর্জনের দ্বারাই ইহলোকে এবং পরলোকে সুখোৎসব সৃষ্টি হয়। মোহমুগ্ধ জনগণ একে অন্যকে দুঃখ দিয়াই, ঘোর দুঃখ আহরণ করিতেছে ॥১৩৩॥

এই সংসারে যত কিছু উপদ্রব, যত কিছু দুঃখ, যত কিছু ভয়, সমস্তই এই 'আমি'কে আঁকড়িয়া ধরার জন্য। সুতরাং আমার এই 'আমি'কে আঁকড়িয়া ধরিয়া লাভ কী ॥১৩৪॥

অগ্নিকে ত্যাগ না করিয়া যেমন দাহত্যাগ সম্ভব নহে, সেইরূপ 'আমি'কে ত্যাগ না করিয়া দুঃখবর্জন সম্ভব নহে ॥১৩৫॥

অতএব, নিজের এবং পরের উভয়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য, আমি আমার এই 'আমি' অন্যকে দান করিতেছি। এবং অন্যকে 'আমি'র ন্যায় গ্রহণ করিতেছি ॥১৩৬॥

'আমি অন্যের'— হে মন, ইহাই তোমার সিদ্ধান্ত হউক। সর্বজীবের স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন, এখন তুমি আর অন্য কিছু চিন্তা করিও না ॥১৩৭॥

এই চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়, যাহা অন্যের—তাহার দ্বারা আমার নিজের দর্শনাদি (স্বার্থসিদ্ধি) উচিত নহে। সেইরূপ অন্যদীয় এই করচরণাদির দ্বারা আমার নিজের (গমনাদি) স্বার্থ-সাধন কর্তব্য নহে ॥১৩৮॥

অতএব, পরার্থপর হইয়া, এই দেহে যাহা যাহা (প্রয়োজনীয়) দর্শন করিতেছ, তাহাই ইহা হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া, অপরের হিতাচরণ করো ॥১৩৯॥

হীনজনে 'আমিত্ব' এবং আপনাতে পরত্ব আরোপ করো। তাহার পর অবিকৃতচিত্তে ঈর্ষা ও অহংকার উৎপন্ন করো ॥১৪০॥

"ইনি সম্মান পান—আমি পাই না। ইনি যেমন লাভবান, আমি সেরূপ নহি। ইনি প্রশংসিত হইতেছেন, আমি নিন্দিত হইতেছি। ইনি সুখী, আমি দুঃখী। আমি কর্ম করিতেছি, ইনি (নিষ্কর্মা হইয়া) সুখে অবস্থান করিতেছেন। এ সংসারে ইনি কিনা মহৎ, আর আমি কিনা নীচ নিগুণ ॥১৪১-৪২॥

"নিগুণের প্রতি কি কোনো কর্তব্য নাই। একেবারে নিগুণই বা কে। সকলেরই কিছু না কিছু গুণ আছে। যেমন অনেকের নিকট আমি নীচ, হীন; তেমনি অনেকের নিকট আমি শ্রেষ্ঠ ॥১৪৩॥

"আমার শীল এবং দৃষ্টির (ধর্মমতের) যে বিঘ্ন হইতেছে, তাহা আমার জন্য নহে। ক্লেশ (রাগাদি)-শক্তিবশতই তাহা হইতেছে। অতএব, আমার (ঐ রাগাদি-ব্যাধির জন্য) যথাশক্তি চিকিৎসার প্রয়োজন। এইজন্য, চিকিৎসাক্রিয়ার দুঃখও আমি স্বীকার করিয়াছি। ইনি যদি আমার চিকিৎসা না করেন—না করুন, কিন্তু অপমান করিতেছেন কেন। ইঁহার আত্মা গুণবান। কিন্তু ইঁহার গুণের দ্বারা আমার কী কাজ হইবে ॥১৪৪-৪৫॥

"দুর্গতিরূপ-মহাসর্পের মুখে যে রহিয়াছে, সেই বিপন্ন ব্যক্তির প্রতিও ইঁহার করুণা নাই"; আর গুণগর্বে ইনি বিদ্বানগণকে জয় করিতে চান ॥১৪৬॥

(পরাত্মে পরিবর্তিত) নিজেকে অন্যের সমান দেখিলে, নিজের গুণবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। কলহের দ্বারাও নিজের লাভ ও সম্মান আদায় করিবে ॥১৪৭॥

"এই পৃথিবীর সর্বত্র যদি আমার গুণ প্রকাশিত হয় এবং ইঁহার ('আমি'র) গুণের কথা যদি কেহ না শ্রবণ করে ॥১৪৮॥

"(পরাত্মে পরিবর্তিত) আমার দোষসমূহ আচ্ছাদিত থাকে। আর ইঁহার পূজা না হইয়া আমার হয়। হাঁ, আজ আমার লভাবস্থসমূহ লাভ হইয়াছে। আজ ইনি নহেন, আমিই পূজিত হইতেছি ॥১৪৯॥

"আজ আমরা আনন্দিতচিত্তে, বহুকাল পরে, ইঁহাকে অপদস্থ, সকলের বিদ্রূপভাজন এবং ইতস্তত নিন্দিত হইতে দেখিতেছি ॥১৫০॥

"এই অভাজনেরও কিনা আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই ইঁহার বিদ্যা। এই ইঁহার জ্ঞান। এই ইঁহার রূপ। এই ইঁহার কুল। এই ইঁহার ধন" ॥১৫১॥

এইভাবে ইতস্তত কীর্তামান নিজের (পররূপে পরিবর্তিত আমার) গুণ শ্রবণ করিয়া পুলকিত হৃষ্ট হইয়া আমি আনন্দোৎসব উপভোগ করিব[১] ॥১৫২॥

১ যাহারা নীচ ও হীন ছিল, তাহারা এই সাধকের চেষ্টায় তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল। পূর্বে তাহাদের গুণের

"যদ্যপি ইহার ধনাদি লাভ হয়, ঐ লাভ বলপূর্বক আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। যদি এ আমাদের কাজ করে, তবে কেবল ইহার জীবিকামাত্রই ইহাকে দিবে—তাহার বেশি নহে ॥১৫৩॥

"ইহাকে সুখ হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। আমাদের দুঃখের ভার ইহার উপর চাপাইয়া দিতে হইবে। ইহার দ্বারাই আমরা শত শত বার জন্মমৃত্যুর (সংসারের) ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছি[১]" ॥১৫৪॥

অসংখ্য অপরিমেয় কল্প তোমার স্বার্থের সন্ধানে অতীত হইয়াছে। সেই বিরাট শ্রমের দ্বারা তুমি কেবল দুঃখমাত্রই অর্জন করিয়াছ ॥১৫৫॥

(পরকে) 'আমি' জ্ঞানে সেইভাবেই এ বিষয়েও (এই পরাত্মপরিবর্তনে) নির্বিচারে প্রবৃত্ত হও। পরে, ইহার গুণ প্রত্যক্ষ করিবে। মুনির বচন মিথ্যা নহে ॥১৫৬॥

যদি তুমি এই কর্ম (পরাত্মপরিবর্তন) পূর্বে করিতে, তাহা হইলে, তোমার এরূপ দশা হইত না। বুদ্ধত্ব-অবস্থার সম্যক্ সুখ তোমার লাভ হইত ॥১৫৭॥

অতএব, যেমন তুমি (যাহা 'তুমি' নহ, সেই) অন্যদীয় শুক্রশোণিতবিন্দুসমূহে (অর্থাৎ তথাকথিত তোমার দেহে) 'আমিত্ব' আরোপ করিয়াছিলে, সেইরূপ অন্যজনে তাহা (আমিত্ব) আরোপ করো। অন্যজনগণকে তুমি 'তুমি' মনে করো ॥১৫৮॥

অন্যের গুপ্তচর হইয়া, এই দেহে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় বস্তু দর্শন করিতেছ, তাহাই অপহরণ করিয়া, অন্য জনগণের হিতাচরণ করো ॥১৫৯॥

"এ সুস্থ—অন্যেরা দুঃস্থ। এ সম্মানিত, উচ্চপদস্থ, অন্যেরা দীন, হীন, নীচ। এ নিষ্কর্মা। অন্যেরা কাজ করিতেছে।" এইভাবে, তুমি নিজেই (পর সাজিয়া) নিজেকে ঈর্ষা করো ॥১৬০॥

কথা কেহ জানিত না। কেহই তাহাদের সম্মান করিত না। তাহারা নির্গুণ ও নিঃস্ব ছিল। এই সাধকই তখন গুণী, লাভবান ও সম্মানিত হইতেছিলেন। আজ তাহার বিপরীত হইয়াছে।

আজ সেই হীনজনগণই সর্ববিষয়ে এতদূর উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, নানাগুণযুক্ত এই সাধকই তাহাদের তুলনায় নিকৃষ্ট প্রতিভাত হইতেছেন। আজ সর্বত্র সাধকের নহে—তাহাদেরই গুণ কীর্তিত হইতেছে। কিন্তু তাহা শুনিয়া সাধকের দুঃখ না হইয়া আনন্দ হইতেছে। কেননা, সাধকের আত্মা এখন অভ্যাসবলে তাহাদের আত্মাতে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের গুণ এখন তাঁহার নিজেরই গুণ বলিয়া মনে হইতেছে। তাই নিজের গুণস্তুতি শুনিয়া যেমন আনন্দ হয়, অপরের গুণস্তুতি শুনিয়া তেমনি আনন্দ হইতেছে। এই আনন্দের পরিমাণ বরং পূর্বাপেক্ষাও অধিক। কেননা, পূর্বে এক 'আমি'র গুণস্তুতিতে যে-পরিমাণ আনন্দ হইত, এখন, নানা স্থানে, বহু 'আমি'র গুণস্তুতিতে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ ও বহুকালব্যাপী আনন্দ হইতেছে। পূর্বে অন্যের গুণস্তুতিতে যে-দুঃখ হইত, এখন তাহার সম্ভাবনাও সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

১ 'ইহার দ্বারাই'—অর্থাৎ এই অহং এর দ্বারাই বা অহংজ্ঞানের জন্যই যত দুঃখ, যত বাধা। এই অহংজ্ঞান বর্তমান থাকাতেই শত শত বার জন্মমৃত্যুর ব্যথা সহিতে হইয়াছে।

তোমার এই 'তুমি'কে সুখ হইতে বিচ্যুত করো। পরের দুঃখের ভার গ্রহণ করাও। এ কখন কী করিতেছে—ইহার সমস্ত ছলচাতুরী লক্ষ্য করো ॥১৬১॥

অন্যের কৃত দোষও ইহার মস্তকে স্থাপন করো। ইহার সামান্য দোষও মহামুনির নিকট প্রকাশ করো ॥১৬২॥

অন্যের অধিক যশের কথা কীর্তন করিয়া, ইহার যশ মলিন করিয়া দাও। নিকৃষ্ট দাসের ন্যায় ইহাকে জীবসেবায় খাটাইয়া লও ॥১৬৩॥

এই দোষপরিপূর্ণ ব্যক্তি কোনোরূপে প্রাপ্ত সামান্য গুণলেশের জন্য স্তুতির যোগ্য নহে। ইহার গুণের কথা যাহাতে কেহ না জানিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করো ॥১৬৪॥

অধিক কী বলিব। তোমার ওই 'তুমির' জন্য, অপরের যাহা কিছু অপকার করিয়াছ, পরের উপকারের জন্য, আজ সেই সমস্ত দুঃখবিপদ তোমার ওই 'তুমির' উপর নিক্ষেপ করো ॥১৬৫॥

যাহাতে এ মুখর হয়, তেমন কোনো উৎসাহ ইহাকে দিবে না। নববধূর ন্যায় ইহাকে লজ্জিত, ভীত এবং সংবৃত করিয়া রাখিবে ॥১৬৬॥

'এমনি করো'। 'এমনি থাকো'। 'এমনি করিবে না'। এইভাবে ইহাকে বশীভূত রাখিবে। আদেশ অমান্য করিলে নিগ্রহ করিবে ॥১৬৭॥

হে চিত্ত, এইভাবে আদিষ্ট হইলেও তুমি যদি ইহা না কর, আমি তোমাকে নিগ্রহ করিব। তুমিই সমস্ত দোষের আশ্রয় ॥১৬৮॥

যাইবে কোথায়। আমি তোমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি। তোমার সর্ব দর্প চূর্ণ করিব। একদিন তুমি আমার বিনাশসাধন করিয়াছিলে, কিন্তু সেদিন আজ আর নাই ॥১৬৯॥

'আজও আমার স্বত্ব রহিয়াছে'—এই আশা এখন ত্যাগ করো। অতীত দুঃখরাশির কথা চিন্তা করিয়া, আমি তোমাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছি ॥১৭০॥

প্রমাদবশত, তোমায় যদি আমি জীবগণকে না দিই, তাহা হইলে তুমিই আমায় নরকপালগণকে দান করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥১৭১॥

এইভাবে, বহুবার তাহাদের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া, তুমি আমাকে দীর্ঘকাল দুঃখ দিয়াছ। সেই শত্রুতার বিষয় স্মরণ করিয়া, হে স্বার্থদাস, আমি তোমাকে বধ করিব ॥১৭২॥

যদি তোমার (যথার্থই) আত্মপ্রীতি থাকে, তবে আত্মাকে প্রীতি করিও না। যদি (যথার্থই) আত্মরক্ষা চাও—আত্মাকে রক্ষা করিও না ॥১৭৩॥

এই দেহকে তুমি যে-পরিমাণে পালন করিতেছ, সেই পরিমাণেই এ পেলব ও সুকুমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে ॥১৭৪॥

এইভাবে পতিত এই দেহের বাঞ্ছাপূরণের জন্য সমস্ত বসুন্ধরাও যথেষ্ট নহে। অতএব ইহার ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য করিবে কে ॥১৭৫॥

যাহা ক্ষমতার বাহিরে, তাহা ইচ্ছা করিলে, ক্লেশ উৎপন্ন হয় এবং আশাভঙ্গ হয়। যে কোনো কিছুই আশা করে না, তাহার সম্পদ কখনো ক্ষয় হয় না ॥১৭৬॥

অতএব, দেহের আকাঙ্ক্ষাকে স্বচ্ছন্দগতিতে বর্ধিত হইতে দিবে না। সে যাহা ইষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিবে না, তাহাই কল্যাণীয় বলিয়া জানিবে ॥১৭৭॥

ভয়ংকর অশুচির প্রতিমূর্তি এই দেহ। ভস্মেই ইহার অবসান। ইহা নিশ্চেষ্ট। অন্যে ইহাকে চালনা করে। ইহাতে আমার আগ্রহ কেন ॥১৭৮॥

জীবন্ত অথবা মৃত এই যন্ত্রে, আমার কী প্রয়োজন। লোষ্ট্রাদি হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়। হায় অহংকার তোমার বিনাশ নাই ॥১৭৯॥

শরীরের প্রতি পক্ষপাতবশত বৃথাই দুঃখ সঞ্চয় করিতেছ। এই কাষ্ঠতুল্য বস্তুর স্নেহই বা কী, আর বিদ্বেষই বা কী ॥১৮০॥

এইভাবে, আমার দ্বারা পালিত হইলেও, অথবা গৃধ্রাদির দ্বারা ভক্ষিত হইলেও, ইহার স্নেহও নাই এবং বিদ্বেষও নাই। অতএব, ইহাকে আমি স্নেহ করি কেন ॥১৮১॥

যাহাকে অপদস্থ করিলে আমার রোষ হয়, এবং যাহাকে অর্চনা করিলে আমার সন্তোষ হয়, সে-ই যদি তাহা (অপমান ও অর্চনা) জানিতে না পারে, তবে কাহার জন্য আমি পরিশ্রম করিতেছি ॥১৮২॥

যাহারা এই দেহকে ভালবাসে, তাহারাও কিনা আমার সুহৃদ্। সকলেই তো নিজ নিজ দেহকে ভালবাসে, তবে তাহারা সকলেই কেন আমার সুহৃদ্ বা প্রিয় নহে ॥১৮৩॥

জগতের হিতের জন্য, এই দেহকে আমি নিরাসক্ত হইয়া (কোনোরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া) দান করিয়াছি বলিয়াই—বহুদোষে দুষ্ট হইলেও, কর্মের যন্ত্র বা উপকরণস্বরূপ ইহাকে আমি ধারণ করিতেছি[১] ॥১৮৪॥

অতএব, প্রাকৃতজনের আচরণে আমার কাজ নাই। সতর্কতার (অপ্রমাদের) কথা স্মরণ রাখিয়া, চিত্তের জড়ত্ব, অশান্তভাব ও অকর্মণ্যতা (স্ত্যান-মিদ্ধ) দূর করিয়া, আমি প্রাজ্ঞজনকে অনুসরণ করিব ॥১৮৫॥

অতএব বিমার্গ হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া 'আবরণ'[২] অপসারিত করিবার জন্য, স্বীয় ধ্যেয় বস্তুতে ('আলম্বনে') আমি তাহাকে নিরন্তর সমাধিস্থ রাখিব ॥১৮৬॥

---

১ তুলনীয়—৫।৬৬।

২ 'আবরণ' দুই প্রকার (১) 'ক্লেশাবরণ' ও (২) 'জ্ঞেয়াবরণ'।

রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, ঈর্ষা, মোহ, মাৎসর্যাদি (ত্রিশটি ক্লেশ ও উপক্লেশ) পরমতত্ত্ব (বা মোক্ষ) কে আবৃত করিয়া রাখে, তাই তাহাদিগকে 'আবরণ' বলা হয়।

জ্ঞেয়—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী মহাযান সম্প্রদায়ের মতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ অসৎ। উহা কাল্পনিক—বস্তুত উহার অস্তিত্ব নাই। উহা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া উহাও 'আবরণ'।

পরিশিষ্ট

সুপুষ্পচন্দ্রের আত্মদান

শূরদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। রত্নাবতী নগরী ছিল তাঁহার রাজধানী। তাঁহার রাজ্যের অধিবাসিগণ—জ্ঞানহীন কুপথগামী। তাই বহু বোধিসত্ত্ব উহাদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু রাজাজ্ঞায় তাঁহারা নির্বাসিত হন।

সেই নির্বাসিত 'সুগত-সুতগণ' 'সমন্তভদ্র' নামে এক অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহাদের সহকর্মী ছিলেন সুপুষ্পচন্দ্র। তিনি এই কুমার্গগামিদের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সংকল্প করিলেন—"আমি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, রাজ্যে প্রবেশপূর্বক ইহাদিগকে কল্যাণমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিব।" তাঁহার সেই সংকল্পের বিষয় তিনি অন্য বোধিসত্ত্বদের বলিলেন।

এই কার্যে মৃত্যু অনিবার্য—ইহা জানাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

সুপুষ্পচন্দ্রও তাহা জানিতেন। তথাপি "একের দুঃখের দ্বারা বহু দুঃখীর দুঃখ নিবারণের জন্য", তিনি তাঁহার সংকল্পে অটল রহিলেন। আত্মবলিদানে কৃতসংকল্প সেই বোধিসত্ত্ব সেই বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া, ধর্মপ্রচার করিতে করিতে— অবশেষে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

মূর্তিমান ধর্মের ন্যায় এই মৃত্যুবিজয়ী বীরের সংস্পর্শে যে-কেহ আসিল—স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহের ন্যায়—জীবন তাহার পরিবর্তিত হইয়া গেল। সাধারণের কথা দূরে থাক, রাজপুরোহিত, রাজমন্ত্রী, রাজপুত্র পর্যন্ত তাঁহার অনুগামী হইলেন।

রাজা যখন দেখিলেন— রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী তাঁহার প্রতি এইভাবে আকৃষ্ট হইতেছে, তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া, তিনি সেই বোধিসত্ত্বের বধের আদেশ দিলেন। তখন :—

'বন্দীর' দেহ ছিঁড়িল ঘাতক, সাঁড়াশী করিয়া দগ্ধ
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি একটি কাতর শব্দ।

রাজাজ্ঞায় ঘাতক, সংদংশিকার দ্বারা, সেই মহাত্মার প্রতি অঙ্গ ক্রমে ক্রমে ছিন্ন করিয়া, চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিল।

কিন্তু তাঁহার জীবনদান ব্যর্থ হইল না। ঐ নিষ্ঠুর রাজার লৌহময় হৃদয়ও অনুতাপানলে দ্রবীভূত হইয়াছিল।

যুগে যুগে, এইভাবে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। ইহারই ফলস্বরূপ—পূর্বে ও পশ্চিমে, আজ প্রায় সমস্ত জগৎ এই আত্মোৎসর্গকারী মহামানবগণের ধর্মের শরণ লইয়াছে।

আর্যদেবের মহাপ্রস্থান[১]

নাহি চন্দ্র, নাহি সূর্য, নাহি গ্রহ, নক্ষত্রনিকর।
নাহি তৃণ, তরুলতা, নদ নদী, পর্বত, প্রান্তর।
নাহি প্রাণ, নাহি প্রাণী, পশুপক্ষী, নাহিক মানব।
শূন্য, শূন্য—মহাশূন্য, আকাশের মতো শূন্য সব।
নাহি জন্ম, নাহি মৃত্যু, ইহলোক নাহি পরলোক।
স্বপ্নসম শূন্য সব, কার তরে করিতেছ শোক।
কোথা সুখ, কোথা দুঃখ। কেবা মিত্র কেবা তব অরি।
কী বা প্রিয়। কী অপ্রিয়। কাঁদিতেছ কোন্ কথা স্মরি।
কী ছিল না। কী লভিলে। কী বা ছিল, কী বা গেল চলি।
নাহি ছিল—নাহি আছে—নাহি হবে, শূন্য যে-সকলি।
কে কাহারে কী বা দিল। কে কাহার করিল সম্মান।
কে কাহার কী বা নিল। করিল কে কারে অপমান।
কোথা রূপ। কোথা তৃষ্ণা। কী যে তুমি করিছ বিচার।
কে জন্মিল। কে মরিল। কে বা বদ্ধ। মুক্তি হবে কার।

এই চতুর্দশপদী পদ্যটি এই বোধিচর্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদের কতিপয় শ্লোকের ভাবানুবাদ। যে-মহামানবের মহাপ্রস্থানের বিষয় লিখিতে উদ্যোগী হইয়াছি, তাহার পটভূমির জন্য ইহার প্রয়োজন।

আচার্য আর্যদেব শূন্যবাদী বৌদ্ধ ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের[২] এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম।[৩] মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পরমপূজ্য আচার্য শূন্যবাদী নাগার্জুনের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য। কী প্রতিভায়, কী পাণ্ডিত্যে, কী বাগ্মিতায়, কী চরিত্রের মাধুর্যে, তৎকালীন বৌদ্ধসমাজে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

---

১ বোধিসত্ত্ব সুপুষ্পচন্দ্রের ন্যায় আর এক বোধিসত্ত্বের অপূর্ব জীবনী আমরা চীনসাহিত্য হইতে লাভ করিয়াছি। উহাই এখানে প্রকাশিত হইল।

চীনভাষায়, (১) কুমারজীব এবং (২) Chi-chia-ye (Ki-kia-ye) ও Than-yao কর্তৃক অনূদিত আর্যদেবের দুইখানি জীবনচরিত হইতে এই ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছে। এই ঘটনা সম্বন্ধে ঐ দুই জীবনচরিতকারের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া যায়। কুমারজীব ৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং Chi-chia-ye (Ki-kia-ye) ও Than-yao এই দুইজন সম্মিলিতভাবে ৪৭২ খ্রীঃ উহা অনুবাদ করেন। কুমারজীব ও ইঁহাদের নাম অনুবাদকরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। জীবনচরিতকার ইঁহারাই বা অন্য কেহ তাহা জানা যায় না।

Vide Chinese Catalogue by Bunyiu Nanjio, No. 1462, No. 1340.

২ চীনভাষায় রক্ষিত তাঁহার দুইটি জীবনচরিতেই দক্ষিণভারতে তাঁহার জন্ম বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু তিব্বতীগ্রন্থে লিখিত আছে যে তাঁহার জন্ম সিংহলে।

৩ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে তাঁহার জন্ম।

একবার দাক্ষিণাত্যের এক রাজার উদ্যোগে আহুত এক বিরাট বিচারসভায়, তিনি তত্রস্থ সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করেন[১]। পরাজিত পণ্ডিতগণ বিচারের নিয়মানুযায়ী বৌদ্ধ শূন্যবাদ স্বীকার করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষা লইলেন। কিন্তু হায়, এই জন্যই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। এই পরাজিত পণ্ডিতমণ্ডলীর কাহারও এক উদ্ধত শিষ্য, গুরুর পরাজয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, আর্যদেবকে উদ্দেশ করিয়া শপথ করিল—"জ্ঞানের দ্বারা তুমি জয়ী হইয়াছ। আমি জয়ী হইব কৃপাণের দ্বারা।"

সে তাহার প্রতিহিংসার সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল।

লোকালয় হইতে দূরে, একান্তে, এক নির্জন অরণ্যে, আচার্য আর্যদেব, শিষ্যগণসহ, ধ্যানে এবং শাস্ত্রচর্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই তপোবনেই, তিনি তাঁহার "শতশাস্ত্র" ও "চতুঃশতক"[২] রচনা করেন।

একদিন, যখন তিনি তাঁহার যোগাসন হইতে উত্থিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন, শিষ্যগণ যখন অন্যত্র ধ্যানমগ্ন, তখন হত্যাকারী, সহসা সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া উঠিল—"'শূন্য'-অস্ত্রের দ্বারা তুমি আমাদের জয় করিয়াছিলে, আজ 'প্রকৃত'-অস্ত্রের দ্বারা আমি তোমাকে জয় করিলাম।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাঁহার উদরে অস্ত্রাঘাত করিল।

দারুণ আঘাতে পাকস্থলী হইতে অন্ত্রসমূহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—জীবনপ্রদীপ নির্বাণোন্মুখ, তথাপি প্রশান্ত আর্যদেব, করুণাপূর্বক হত্যাকারীকে বলিলেন—"বৎস, ঐ আমার কাষায়বস্ত্র, ঐ আমার ভিক্ষাপাত্র, উহা লইয়া, ভিক্ষুর বেশে অবিলম্বে ঐ পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করো। আমার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এখনও অজ্ঞান, তাহারা তোমাকে বন্দী করিয়া রাজসকাশে প্রেরণ করিবে। এখনও তোমার দেহের মায়া দূর হয় নাই, সুতরাং দেহনাশের দুঃখ সহিতে পারিবে না।"

প্রাণশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, দেহত্যাগের আর বড় বিলম্ব নাই, এমন সময় কোনো এক শিষ্য দৈবক্রমে তথায় আসিয়া পড়িলেন। এই শিষ্যের করুণ আহ্বানে চতুর্দিক হইতে শিষ্যবৃন্দ দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদের প্রিয়তম আচার্যের সেই শোকাবহ অবস্থা দেখিয়া, কেহ স্তম্ভিত, কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কেহ উন্মত্তবৎ রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ বা হত্যাকারীর সন্ধানে ইতস্তত ধাবমান হইলেন। "কে হত্যা করিল।" "এই নৃশংস অত্যাচার করিল কে।" "হত্যাকারী কোথায় গেল।" অরণ্যে, পর্বতে, দিকে দিকে, এই প্রশ্ন মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতে লাগিল।

---

১ জীবনচরিতকার কুমারজীব লিখিয়াছেন—এই সভায় এত পণ্ডিতসমাগম হয় যে, রাজাকে প্রতিদিন দশ শকটপূর্ণ খাদ্য ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিতে হইত। তিন মাস যাবৎ এই বিচার চলিতে থাকে, এবং এই তিন মাসের মধ্যে এক লক্ষের অধিক লোক শূন্যবাদে দীক্ষিত হয়।

২ কুমারজীবকৃত জীবনচরিতে "শতশাস্ত্র" ও "চতুঃশতক" এই উভয় গ্রন্থের কথাই আছে। কিন্তু অন্য জীবনচরিতখানিতে কেবল "শতশাস্ত্রের" কথা আছে।

তখন সেই মহারণ্য, সেই তাপসজনশূন্য তপোবনভূমি সচকিত করিয়া মুমূর্ষুর অবরুদ্ধ কণ্ঠ সহসা ফুকারিয়া উঠিল :—

নাহি প্রাণ, নাহি প্রাণী, নাহি হত্যা, নাহি অত্যাচার।
জন্ম নাহি, মৃত্যু নাহি, নাহি সুখ, দুঃখ হাহাকার।
কে তোমার প্রিয়জন। কার তরে কর অশ্রুপাত।
কে মারিল। কে মরিল। কে করিল কারে অস্ত্রাঘাত।
ছিন্ন হোক মোহবন্ধ সব। মিথ্যাদৃষ্টি হোক তিরোহিত।
মহাব্যোম-সমান-শূন্যতা—শান্ত, শিব, প্রপঞ্চ-অতীত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(শেষাংশ)

পূর্ববুদ্ধগণ যে-ভাবে বোধিচিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষাতে তাঁহারা যে-ভাবে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেইভাবে জগতের হিতের জন্য আমি বোধিচিত্ত উৎপন্ন করিব। সেইভাবেই সেই সমস্ত শিক্ষা আমি যথাক্রমে শিক্ষা করিব ॥২২-২৩॥

মতিমান ব্যক্তি বোধিচিত্তকে এমনি শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করিয়া, ঐ বর্ধিত সংকল্পকে (বোধিচিত্তকে) অধিকতর শক্তি দিবার জন্য এইভাবে চিত্তকে হর্ষান্বিত করিবে ॥২৪॥

"আজ আমার জন্ম সফল হইয়াছে। মানবদেহলাভ সার্থক হইয়াছে। আজ আমি বুদ্ধকুলে জন্মলাভ করিলাম। আজ আমি বুদ্ধের পুত্র হইলাম ॥২৫॥

"নির্মল এই কুলের যাহাতে কলঙ্ক না হয়, সেইজন্য যাঁহারা নিজ কুলোচিত সদাচার অনুসরণ করিয়া থাকেন, এখন আমাকে তাঁহাদের ন্যায় কার্য করিতে হইবে ॥২৬॥

"আবর্জনাস্তূপ হইতে অন্ধ যে-ভাবে রত্নলাভ করে, সেইভাবে কোনোরকমে (দৈবাৎ) আমার মধ্যে এই বোধিচিত্তের অভ্যুদয় হইয়াছে ॥২৭॥

"এই বোধিচিত্ত এক অপূর্ব রসায়ন। জগতের মৃত্যুনাশের জন্য ইহার উৎপত্তি। ইহা অক্ষয় নিধি—সমস্ত জগতের দারিদ্র্য মোচন করিবে। ইহা মহৌষধি—সমস্ত জগতের ব্যাধি দূর করিবে। ভবমার্গে ভ্রমণক্লান্ত জগতের ইহাই সর্বশ্রমহারী বনস্পতি ॥২৮-২৯॥

"পথিকগণের দুর্গতি-নদী-উত্তরণের জন্য ইহাই সাধারণ সেতু। জগতের ক্লেশতাপ শান্ত করিবার জন্য এই চিত্ত-চন্দ্রমা উদিত হইয়াছেন। জগতের মোহান্ধকার দূরীকরণের জন্য এই মহারবি আবির্ভূত হইয়াছেন। সদ্ধর্মক্ষীর মন্থন করিয়া এই নবনী উত্থিত হইয়াছে ॥৩০-৩১॥

"ভবমার্গচারী সুখভোগবুভুক্ষু সার্থবাহ-জনগণের এই সুখ-সত্র সমীপে বিরাজমান। ইহা সমস্ত অভ্যাগত প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিবে ॥৩২॥

"একদিকে বুদ্ধত্ব আর একদিকে সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্য—এই উভয়ের মধ্যেই সমস্ত জগৎকে সর্বত্রাতাগণের সম্মুখে, আজ আমি নিমন্ত্রণ করিলাম। সর্বসুরাসুরাদি কর্তৃক ইহা অভিনন্দিত হউক" ॥৩৩॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(প্রথমাংশ)

এইভাবে, সুদৃঢ়রূপে বোধিচিত্ত গ্রহণ করিয়া, শিক্ষা (বা কর্তব্যবিষয়) যাহাতে লঙ্ঘিত না হয়, জিনাত্মজ বোধিসত্ত্ব সে-বিষয়ে তন্দ্রাহীনচিত্তে প্রযত্ন করিবে ॥১॥

যাহা সম্যক্‌ভাবে বিবেচনা না করিয়া সহসা আরম্ভ করা হইয়াছে, তাহা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়া থাকিলেও তাহা (শেষ) করিবে কি করিবে না—এইরূপ ইতস্তত ভাব যুক্তিযুক্ত ॥২॥

কিন্তু যাহা বুদ্ধগণ এবং তাঁহাদের মহাজ্ঞানী আত্মজগণ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন এবং আমিও যথাশক্তি বিবেচনা করিয়াছি—সেই কার্যে বিলম্ব কেন ॥৩॥

যদি এইভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া, কার্যত তাহা না করি, তাহা হইলে এই সমস্ত জীবগণকে বঞ্চিত করিয়া আমার কী গতি হইবে ॥৪॥

মনে মনে সংকল্প করিয়া যে-ব্যক্তি দান না করে, সেই দাতব্য বস্তু অতি তুচ্ছ হইলেও তাহার জন্যই সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় ॥৫॥

আর অনুত্তম সুখদানের বিষয়ে, আন্তরিকভাবে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া সমস্ত জগতকে বঞ্চিত করিলে তাহার কী গতি হইবে ॥৬॥

তবে কর্মের যে কী গতি তাহা আমাদের চিন্তার অতীত। কর্মের সেই অচিন্ত্য গতিকে একমাত্র সর্বজ্ঞ বুদ্ধই জানেন—কেননা, বোধিচিত্ত ত্যাগ করিলেও সেই (মহাপাপী) নরগণকে তিনি উদ্ধারই করিয়া থাকেন ॥৭॥

বোধিসত্ত্বের সর্বপ্রকার অপরাধেরই গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, তিনি অপরাধী হইয়া সর্বপ্রাণীর স্বার্থহানি করেন ॥৮॥

ক্ষণকালের জন্যও যে ইহার কার্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, প্রাণিগণের সেই স্বার্থনাশকারী ব্যক্তির দুর্গতির সীমা নাই ॥৯॥

কেননা, একটি প্রাণীরও হিত নষ্ট করিলে বিনষ্ট হইতে হয়, আর অনন্ত আকাশব্যাপী নানা লোকস্থিত প্রাণিগণের হিতনাশ করিলে আর কথা কী ॥১০॥

এইভাবে পাপশক্তিবশত এবং বোধিচিত্তবলে এই জন্মমৃত্যুর সাগর-দোলায় দোলায়মান হইয়া—ভূমি-প্রাপ্তিতে[1] তাঁহার বিলম্ব হয় ॥১১॥

অতএব, যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সেই অনুযায়ী শ্রদ্ধাভরে কার্য করিতে হইবে। আজ যদি চেষ্টা না করি, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে তল হইতে অতলে তলাইয়া যাইব ॥১২॥

---

১ ভূমিশব্দ এখানে দ্ব্যর্থক। সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে ভূমিপ্রাপ্তি—অর্থাৎ স্থললাভ। ইহাই উহার সাধারণ অর্থ। অন্যদিকে বোধিসত্ত্বের সাধনার ভূমি, অর্থাৎ সাধনার ক্রমোচ্চ স্তর বা উচ্চ উচ্চতর অবস্থা-প্রাপ্তি।

(চিকিৎসার জন্য দুঃস্থ) প্রাণিগণের অন্বেষণকারী অসংখ্য বুদ্ধ চলিয়া গেলেন, আমি নিজের দোষে তাঁহাদের চিকিৎসাধীন হইলাম না ॥১৩॥

অতীতে পুনঃপুনঃ যে-ভাবে চলিয়াছি—আজও যদি সেইভাবে চলি, তাহা হইলে দুর্গতি, ব্যাধি, মরণ ও ছেদন ভেদনাদিই (এই সংসারে এবং নরকাদিতে) লাভ করিতে থাকিব ॥১৪॥

এইভাবে মানবজন্ম, তথাগত-উৎপত্তি, শ্রদ্ধা এবং শুভকর্ম করিবার যোগ্যতা কবে আর লাভ করিব ॥১৫॥

এইরূপ অন্ন—এইরূপ নিরুপদ্রব ব্যাধিহীন দিনই বা আর কবে পাওয়া যাইবে। জীবন ক্ষণস্থায়ী। উহা আমাদের বঞ্চনা করে। দেহ যাচিত দ্রব্যের ন্যায় (অস্থির) ॥১৬॥

আমার যেরূপ আচরণ তাহাতে মনুষ্যজন্ম আর লাভ হইবে না। উহা না হইলে পাপই সঞ্চিত হইবে। কল্যাণ কোথা হইতে হইবে ॥১৭॥

এখন যখন আমি শুভকর্ম করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াও উহা করিতেছি না, দুর্গতির দুঃখে বিমূঢ় হইয়া তখন তাহা হইলে আমি কী করিব ॥১৮॥

শুভকর্ম না করিয়া, পাপসঞ্চয় করিয়া চলিতে থাকিলে, কোটী কোটী কল্পের জন্য, 'সুগতি' শব্দ পর্যন্ত আমার বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ॥১৯॥

এইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—'মনুষ্যজন্মলাভ মহাসমুদ্রে (কচিৎ ভাসমান) যুগ (জোয়াল)-ছিদ্রের মধ্যে কূর্মের গ্রীবা-প্রবেশের ন্যায় (প্রায় অসম্ভব)' ॥২০॥

এক মুহূর্তের পাপের জন্য অবীচিতে এক কল্পের জন্য বাস করিতে হয়। আর অনন্ত কাল ধরিয়া যে-পাপ সঞ্চিত হইয়াছে— তাহাতে আর সুগতিলাভের আশা কী ॥২১॥

সেই (নির্দিষ্ট) সময় মাত্র কষ্ট-ভোগ করিয়াই যে সে নিষ্কৃতি পায় তাহা নহে, ঐ কষ্ট-ভোগ করিতে করিতেই সে অন্য পাপ উৎপন্ন করে ॥২২॥

এইরূপ সুযোগলাভ করিয়াও যে আমি শুভকর্ম করিলাম না, ইহা অপেক্ষা আত্ম-প্রবঞ্চনা আর কিছু নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর মোহও আর কিছু নাই ॥২৩॥

বিচারবুদ্ধি যদি আমার এমনই হয়, তাহা হইলে আবার মোহমুগ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িব। যমদূতের দ্বারা তাড়িত হইয়া আবার বহুকালের জন্য দুঃখশোক ভোগ করিতে থাকিব ॥২৪॥

দুর্বিসহ নরকাগ্নি আমার দেহকে এবং অনুতাপানল আমার অশিক্ষিত চিত্তকে দীর্ঘকাল ধরিয়া দগ্ধ করিতে থাকিবে ॥২৫॥

এই অতি দুর্লভ হিতাচরণভূমি (নরদেহ) কোনোরূপে লাভ করিয়াছি—তবু হায়, জানিয়া শুনিয়াও আমি পুনরায় সেই নরকরাশি টানিয়া আনিতেছি ॥২৬॥

মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় এ বিষয়ে আমার চেতনা নাই। জানি না কে আমাকে মোহিত করিতেছে। কে আমার অন্তরে রহিয়াছে ॥২৭॥

রাগদ্বেষাদি শত্রুগণ করচরণাদি অঙ্গহীন। তাহারা বীরও নহে বিজ্ঞও নহে। তাহারা আমাকে কৃতদাস করিল কিরূপে ॥২৮॥

আমারই চিত্তে সুখে বাস করিয়া তাহারা আমাকে হত্যা করিতেছে। তথাপি আমি ক্রুদ্ধ হইতেছি না। আমার এই অস্থানসহিষ্ণুতাকে ধিক্ ॥২৯॥

সমস্ত দেবগণ, সমস্ত মনুষ্যজাতিও যদি আমার শত্রু হন, তথাপি তাঁহারা সকলে মিলিয়াও অবীচি-বহ্নি (আমার সমীপে) আনয়ন করিতে সমর্থ হন না ॥৩০॥

যাহার সংস্পর্শে সুমেরু পর্বত পর্যন্ত দগ্ধ হইয়া এমনভাবে নিঃশেষ হইয়া যায় যে, ভস্ম পর্যন্ত তাহার লক্ষ্য হয় না, সেই অবীচি-বহ্নিতে এই বলবান ক্লেশ-শত্রু আমাকে মুহূর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে ॥৩১॥

আমার ক্লেশশত্রুর ন্যায় দীর্ঘ পরমায়ু আর কোনো শত্রুরই নাই। ইহাদের আয়ুর আদিও নাই, অন্তও নাই ॥৩২॥

অনুকূলভাবে সেবা পাইলে সকলেই হিতচেষ্টা করে, আর এই ক্লেশগণ আমার সেবা পাইয়াও অত্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে ॥৩৩॥

শত্রুতা তাহাদের বিরামহীন এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাহারাই বিপদজালসৃষ্টির একমাত্র কারণ। তাহারা হৃদয়ে বাস করিতে থাকিলে, সংসারে আমার নিরুদ্বেগ আনন্দ হইবে কিরূপে ॥৩৪॥

যাহারা এই ভব-কারাগারের রক্ষক, নরকাদিতেও যাহারা ঘাতক, তাহারা যদি আমার মতি-গৃহে, লোভ-পিঞ্জরে অবস্থান করে, তাহা হইলে আমার সুখ কোথা হইতে হইবে ॥৩৫॥

অতএব, যতদিন পর্যন্ত এই শত্রুগণ আমার সমক্ষে নিহত না হয়, ততদিন পর্যন্ত এই 'ভার' আমি ত্যাগ করিব না। যাহারা মানোন্নত পুরুষ তাঁহারা সামান্য অপকারীর উপরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিহত না করিয়া নিদ্রা যান না ॥৩৬॥

যাহারা স্বভাবতই মৃত্যুদুঃখে দুঃখিত, অজ্ঞান (শক্তিহীন, অসহায়), সেই তাহাদিগকেও যুদ্ধক্ষেত্রে বলপূর্বক হত্যা করিবার জন্য উগ্র হইয়া, অগণিত শর ও শক্তির আঘাত-জনিত ব্যথা সহ্য করিয়াও লোকে তাহা (হত্যাকার্য) সাধন না করিয়া বিমুখ হয় না।

আর যাহারা স্বভাবতই আমার শত্রু এবং সতত সর্বদুঃখের কারণ, তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়া মাত্র বিপদশতের দ্বারাই কেন আমার দৈন্য ও অবসাদ আসিতেছে ॥৩৭-৩৮॥

লোকে অকারণেই (যুদ্ধাদিতে) রিপুগণকৃত ক্ষতচিহ্ন শরীরে অলংকারের ন্যায় ধারণ করিয়া থাকে। আর মহাকল্যাণ সাধনে সমুদ্যত আমি; দুঃখ কেন আমাকে বাধা বা পীড়া দিতেছে ॥৩৯॥

কৈবর্ত চণ্ডাল ও কৃষকাদি জনগণ নিজ জীবিকামাত্রের জন্য শীতগ্রীষ্মাদির দুঃখ সহ্য করে। জগতের হিতের জন্য আমি কেন তাহা সহ্য করি না ॥৪০॥

দশদিকে আকাশব্যাপী সমস্ত জীবজগতের ক্লেশমোচনের প্রতিজ্ঞা করিয়া, আমার আত্মাই কিনা ক্লেশমুক্ত হইল না ॥৪১॥

তখন নিজের ওজন না বুঝিয়া বাতুলের ন্যায় প্রলাপ বকিয়াছি—অতএব এখন আর উপায় কী। এখন আমায় সতত ক্লেশহত্যায় অপরাঙ্মুখ হইতেই হইবে ॥৪২॥

এবিষয়ে আমি আগ্রহী হইব। ইহা আমি আঁকড়িয়া ধরিব। আমি বদ্ধবৈর হইয়া ক্লেশঘাতী ক্লেশ ভিন্ন অন্য সমস্ত ক্লেশের সহিত যুদ্ধ করিব ॥৪৩॥

আমার অন্ত্ররাশি গলিয়া যাক, মস্তক আমার খসিয়া পড়ুক, তথাপি ক্লেশ-শত্রুর নিকট আমি নতি স্বীকার করিব না ॥৪৪॥

নির্বাসিত শত্রু দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে শক্তিসঞ্চয় করিয়া পুনরায় আগমন করে। কিন্তু ক্লেশশত্রুর তো এরূপ কোনো গতিবিধি লক্ষ্য হয় না ॥৪৫॥

(পরিচ্ছেদ) ১।৩। (শ্লোক) চিত্তপ্রসাদ—চিত্তের প্রসন্নতা—বা চিত্তের প্রশান্তভাব। ইহা ভিন্ন কোনো সাধনাই সম্ভব নহে। যোগশাস্ত্রে—প্রথমেই চিত্তপ্রসাদনের চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে :—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ পাতঞ্জল দর্শন, ১।৩৩।

"যাহারা সুখভোগ করিতেছে, তাহাদের সুখে সুখ (বন্ধুর ন্যায় আচরণ—ইহাই মৈত্রী) যাহারা দুঃখভোগ করিতেছে, তাহাদের দুঃখে দুঃখ (করুণা) যাহারা পুণ্যাত্মা, তাঁহাদের পুণ্যকর্মে আনন্দ (মুদিতা) এবং যাহারা পুণ্যাত্মা নহে, অথবা যাহারা পাপী, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা—এই ভাব অভ্যাস করিতে করিতে, মন প্রসন্ন (নির্মল) ও প্রশান্ত হয় (তখনই তাহা একাগ্র করা সম্ভব হয়)"।

১।১০। 'জি' ধাতু ('জয় করা') হইতে জিন শব্দের উৎপত্তি। মহাবীর জিন এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম 'জৈন ধর্ম' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদিকে 'মার' বা 'কাম'-বিজয়ী বলিয়া বুদ্ধ (বা বুদ্ধগণ)কেও বৌদ্ধশাস্ত্রে 'জিন' বলা হইয়াছে।

১।১৪-১৫। 'গণ্ডব্যূহসূত্রে',—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়নাথ বোধিসত্ত্ব সুধনকে বলিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ ডক্টর সুজুকি ১৯৩৪ খ্রী: প্রকাশ করিয়াছেন। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিত "The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal" (Published by the Asiatic Society of Bengal, 1882) পুস্তকেও ইহার বিবরণ (৯০ পৃষ্ঠায়) পাওয়া যাইবে।

(১) বোধিপ্রণিহিতচিত্ত ও (২) বোধিপ্রস্থানচিত্ত :—

(১) বোধিতে চিত্তস্থাপন। অর্থাৎ বোধির জন্য সংকল্প। 'সর্বজগতের পরিত্রাণের জন্য বুদ্ধ হইব'—গমনে, শয়নে, স্বপনে, সর্বদা অন্তরে এই প্রার্থনা বা সংকল্প বা আগ্রহ, জাগ্রত করা। ইহাকেই "বোধিপ্রণিহিতচিত্ত" বলা হইয়াছে।

(২) বোধির জন্য যাত্রা। বোধিপ্রাপ্তির জন্য কেবল সংকল্পমাত্র নহে, পরন্তু জীব-সেবাদির দ্বারা তাহা প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা। বোধিপ্রণিহিতচিত্তকে গমনকামী এবং বোধিপ্রস্থানচিত্তকে গমনকারীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

১।২০। সুবাহুপরিপৃচ্ছা। এই গ্রন্থ সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। ইহার কয়েকটী চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ আছে। ধর্মরক্ষ ২৬৫-৩১৬ খ্রীষ্টাব্দে, কুমারজীব ৩৮৪-৪১৭ খ্রী:, এবং বোধিরুচি ৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, ইহা চীনভাষায় অনুবাদ করেন।

১।২৭। "সর্বজগতের পরিত্রাণের জন্য বুদ্ধ হইব" ইহাই বোধিপ্রণিহিতচিত্ত। (সর্বদুঃখ দূর করিয়া) "জগতের সর্বজীবকে, সর্বসুখে সুখী করিবার চেষ্টা"— হইতেছে বোধিপ্রস্থানচিত্ত।

২।২-৬। অপরিগৃহীত বস্তু—যে-বস্তু অপরিগৃহীত, তাহাই নৈবেদ্যের যোগ্য।

২।১৩। সমন্তভদ্র বোধিসত্ত্ব। ইনি হস্তিবাহন এবং কর্ম ও সুখের প্রতীক।

বোধিসত্ত্ব অজিত—মৈত্রেয় বা "ভবিষ্যদ্ বুদ্ধ" বলিয়া অধিকতর প্রসিদ্ধ।

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুঘোষ বা মঞ্জুশ্রী—প্রজ্ঞার প্রতীক। গ্রন্থ ও কৃপাণধারী, পদ্ম বা সিংহের উপর উপবিষ্ট—এইরূপে ইঁহাকে কল্পনা করা হয়।

বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর ('লোক' ধাতু—'দেখা' অর্থে) বা অবলোকিতেশ্বর—মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বোধিসত্ত্বের আদর্শ ইঁহাতে যেন মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত শেষ জীবটি মুক্তিলাভ না করে, যতদিন পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি না হয়, ততদিন ইনি মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিবেন না—বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। অমিতাভ বুদ্ধের স্বর্গ সুখাবতী হইতে (অথবা পর্বত শিখর হইতে) নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দেখিতেছেন—কোথায় কে দুঃখ পাইতেছে। কোথায় কে বিপদে পড়িয়াছে। ইনি একাধারে সমস্ত প্রাণীর পিতা এবং মাতা। প্রাণিগণের অতি তুচ্ছ ভয়টুকুও ইঁহার অন্তরে আঘাত করে। সভার মধ্যে, জনতার মধ্যে, অনেকে অনর্থক উদ্বেগ অনুভব করে, নিজেদের অসহায় (nervous) মনে করে, মানুষের অন্তরের সেই তুচ্ছ উদ্বেগ, সেই মিথ্যা ভয়টুকুও দূর করিবার জন্য তিনি সতত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। সকলের দুঃখমোচনের জন্য তিনি, মর্ত্যের সর্বত্র, এমন কি প্রেতলোকে অথবা নরকে পর্যন্ত গমন করিয়া থাকেন। গ্রন্থ ও সুধাভাণ্ডহস্তে দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট অবস্থায়, কখনো লৌকিক কখনো অলৌকিক রূপে ইঁহাকে কল্পনা করা হয়। বোধিসত্ত্বজগতে ইনি অদ্বিতীয়। মহাযান বৌদ্ধদের মধ্যে (বিশেষ চীনদেশে) ইঁহার পরম আদর—সর্বোচ্চ সম্মান।

২।২১। সদ্ধর্মরত্ন। সদ্ধর্ম অর্থাৎ উত্তম ধর্ম। অথবা বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বাদি সৎ (বা উত্তম) পুরুষের ধর্ম। উহা রত্নের ন্যায় (জ্ঞান-) আলোক দান করে (বা বহুমূল্য) বলিয়াই উহাকে সদ্ধর্মরত্ন বলা হইয়াছে।

২।২৪। যেখানে যেখানে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে এবং বুদ্ধ যাহার পালক সেই লোকসমূহকে 'বুদ্ধক্ষেত্র' বলা হয়।

২।৩০-৩১। রত্নত্রয় বা ত্রিরত্ন। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। এই গ্রন্থের বহুস্থানেই বোধিসত্ত্ব-গণকে সংঘের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

২।৩২। এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্তী শ্লোক হুবহু একরূপ। তিব্বতীতে ইহা নাই, সেজন্য প্রক্ষিপ্তজ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছি। তথাপি এখানে ইহার অর্থ দেওয়া হইল: "হে নায়কগণ, আমি কিরূপে ইহা হইতে নির্গত হইব। (ইহা ভাবিয়া) আমি নিত্য উদ্বিগ্ন রহিয়াছি। সঞ্চিত পাপ ক্ষয় না হইলে আমার যেন সত্বর মৃত্যু না হয়।"

২।৩৬। এই শ্লোক ভাষ্যকার ধরেন নাই—ইহার অর্থ নিম্নে দেওয়া হইল:

"আমার প্রিয়ও থাকিবে না, অপ্রিয়ও থাকিবে না। এবং আমিও থাকিব না। সকলেই চলিয়া যাইবে।"

২।৫৩। বজ্রী বা বজ্রপাণি। বুদ্ধের রক্ষক। পরবর্তী কালে ইনি একজন প্রধান বোধিসত্ত্বরূপে গণ্য হন।

২।৫৫। চতুরধিক চতুঃশত ব্যাধি। ১০০টি অকালমৃত্যু এবং ১টি কালমৃত্যু। এই ১০১ টির প্রত্যেকের বায়ু, পিত্ত, কফ ও সন্নিপাত এই চারি ভেদ। তাহাতে ৪০৪ ব্যাধি

হইয়েছে। প্রজ্ঞাকরমতি তাঁহার ভাষ্যে চতুরধিক চতুঃশত ব্যাধির এইরূপ হিসাব করিয়াছেন।

২।৬৪-৬৬। প্রকৃতি-অবদ্য—স্বভাবতই যাহা দোষের। যথা—(১) হত্যা, (২) চৌর্য, (৩) ব্যভিচার (৪) মিথ্যা-ভাষণ (বা মিথ্যাচার)।

প্রজ্ঞপ্তি-অবদ্য—স্মৃতিশাস্ত্রে বা লোকব্যবহারে বা লোকাচারে যাহা দোষের। উপরোক্ত চারিটি ব্যতীত, আচারলঙ্ঘনাদি অন্য সমস্ত পাপ বা দোষকে প্রজ্ঞপ্তি-অবদ্য বলা হয়।

৩।৮। মহাকল্প, অসংখ্যেয়কল্প ও অন্তরকল্প।

২০টি অন্তরকল্পে এক অসংখ্যেয়কল্প এবং চারিটি অসংখ্যেয়কল্পে এক মহাকল্প হয়। প্রতি অন্তরকল্পের শেষ সাত বছর দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের কথাই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩।১৭। সংক্রম—সেতু বা বাঁধ।

৩।১৯। চিন্তামণি। অলৌকিক মণি। যাহার প্রসাদে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়।

ভদ্রঘট। যে-ঘটের নিকট যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়।

সিদ্ধবিদ্যা। যে-বিদ্যার সাহায্যে সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

মহৌষধি—যাহা সর্বরোগ আরোগ্য করে।

।৪৬। ক্লেশ। ক্লেশ ও উপক্লেশ।

রাগ, প্রতিঘ (দ্বেষ), মোহ, মান (মিথ্যা অভিমান) দৃক্ (মিথ্যাদৃষ্টি) বিচিকিৎসা (সংশয়) এই ছয়টি ক্লেশ।

ক্রোধ, উপনাহ (বৈরি) ম্রক্ষ (দোষাচ্ছাদন), প্রদাশ (পারুষ্য), ঈর্ষা, মাৎসর্য, শাঠ্য, মায়া, মদ, বিহিংসা (জীবহিংসা) আহ্রী (লজ্জার অভাব, কোনো কার্যে নিজেকে অযোগ্য জানিয়াও তাহা নির্লজ্জভাবে করা) অনপত্রপা (পাপকর্মে লজ্জার অভাব) স্ত্যান (চিত্তের অকর্মণ্যতা—জড়ত্ব), ঔদ্ধত্য, আশ্রদ্ধ (অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস) কৌসীদ্য (শুভকর্মে অনুৎসাহ) প্রমাদ, মুষিতা-স্মৃতি (স্মৃতির অভাব), বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্য, কৌকৃত্য (কুৎসিত ব্যবহার, পরিতাপ), মিদ্ধ (চিত্তের অস্বাতন্ত্র্য—ধ্যেয়বিষয়ে অপ্রবৃত্তি), বিতর্ক, বিচার, এই ২৪টি উপক্লেশ।

৫।৬-৮। "রত্নমেঘে" বুদ্ধ বলিয়াছেন—"চিত্তপূর্বংগমাঃ সর্বধর্মাঃ। চিত্তে পরিজ্ঞাতে সর্বধর্মাঃ পরিজ্ঞাতা ভবন্তি"। ধম্মপদ, ১।১-২।

চিত্তেন নীয়তে লোকশ্চিত্তং চিত্তং ন পশ্যতি। চিত্তেন চীয়তে কর্ম শুভং বা যদি বা শুভং॥ চিত্তেনাস্ত বশীভূতেন সর্বে ধর্মা বশীভবন্তি।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"সত্ত্বলোক (জীবলোক) ভাজনলোক (জীবহীন বস্তুলোক) অতি বিচিত্র সমস্ত লোকই চিত্তই রচনা করিতেছে। বলা হইয়াছে যে সমস্ত জগৎ কর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এদিকে আবার চিত্ত ব্যতীত কর্মের অস্তিত্ব নাই।"

রত্নমেঘ—সংস্কৃতে নাই। ইহার কয়েকটি চীনা এবং একটি তিব্বতী অনুবাদ আছে। মন্দ্র এবং সংঘপাল, ৫০৩খ্রীঃ, ধর্মরুচি বা বোধিরুচি ৬৯৩খ্রীঃ চীনভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

৫।১৫। ব্রহ্মত্বাদি। চিত্তের ব্রহ্মত্বাদি প্রাপ্তি হয়।

ব্রহ্ম বিশুদ্ধ নির্দোষ (শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ)। মৈত্রীকরুণাদির অভ্যাসের দ্বারা ক্লেশনির্মুক্ত (উচ্চস্তরের সমাধিপ্রাপ্ত) চিত্তও এরূপ বিশুদ্ধ ও নির্দোষ হয়। উহাই চিত্তের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি। শ্রাবক-যানাচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন—"ব্রহ্মের (বা ব্রহ্মার) চিত্ত বিশুদ্ধ নির্দোষ। তিনি নির্দোষচিত্তে বিহার করেন। মৈত্রীকরুণাদি অভ্যাসের দ্বারা যোগিগণও ব্রহ্মসম হইয়া নির্দোষচিত্তে বিহার করেন। সেইজন্য যোগিচিত্তের মৈত্রীকরুণাদি গুণসমূহকে "ব্রহ্মবিহার" বলা হইয়াছে"। বিসুদ্ধি মগ্‌গ, ৯ম পরিচ্ছেদ।

৫।৩১-৩২। বুদ্ধানুস্মৃতি। বুদ্ধের গুণসমূহের ভাবনা করিতে করিতে সমাধিলাভ। মহাযানী বলেন—বুদ্ধমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে করিতে ঐ ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়া এমন অবস্থা আসে যখন অনায়াসেই সর্বদা সর্বত্র বুদ্ধদর্শন ঘটে।[১]

৫।৮৩। পারমিতা। দানপারমিতা, শীলপারমিতা, ক্ষান্তিপারমিতা, বীর্যপারমিতা, ধ্যানপারমিতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা। এই ছয়টি পারমিতার আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। পারম্+ইত বা ইতা (গমনার্থক 'ই' ধাতুতে 'ত' প্রত্যয় করিয়া 'ইত') যাহা পারে গিয়াছে অর্থাৎ—চরম, প্রকর্ষ বা প্রকৃষ্ট। সর্বোচ্চ দান সর্বোচ্চ শীল ইত্যাদি। পারমিতার সর্বোচ্চ সংখ্যা দশ। যথা—দান, শীল, নৈষ্কর্ম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান (চিত্তের দৃঢ়তা) মৈত্রী, উপেক্ষা।

৫।১০২-১০৩। কল্যাণমিত্র। (যে-বন্ধু কল্যাণের জন্য) যিনি কল্যাণলাভে সাহায্য করেন। একাধারে গুরু, বন্ধু ও আত্মীয়সম। ধর্মপথে, ধ্যানধারণাদিতে, অগ্রসর হইতে হইলে, এইরূপ এক বন্ধুর একান্ত প্রয়োজন।

সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, চরিত্রবান্, সত্যদ্রষ্টা ও ধ্যানাদিতে সিদ্ধ ব্যক্তিকেই কল্যাণমিত্ররূপে গ্রহণ করা উচিত। বলা হইয়াছে, এইরূপ কল্যাণমিত্র ব্যতীত শিক্ষার্থী, সারথিবিহীন রথের ন্যায়, অথবা মাহুতহীন হস্তীর ন্যায় বিপথে বা বিপদে পড়িতে পারেন।

৫।১০৩। শ্রীসংভববিমোক্ষ—পূর্বোক্ত 'গণ্ডব্যূহের' এক পরিচ্ছেদের নাম।

৫।১০৪। আকাশগর্ভসূত্র। সংস্কৃতে নাই। ইহার কয়েকটি চীনা ও একটি তিব্বতী অনুবাদ আছে। বুদ্ধযশস্ (বা বুদ্ধকীর্তি) ৩৮৪-৪১৭ খ্রীঃ, ধর্মমিত্র ৪২০-৪৭৯খ্রীঃ, এবং জ্ঞানগুপ্ত ৫৮৯-৬১৮খ্রীঃ, চীনভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

মূলাপত্তি। মূল পাপ বা অপরাধ (আপত্তি)।

অসংস্কৃতবুদ্ধি প্রাকৃতজনের নিকট পরমগম্ভীর শূন্যতার উপদেশদান বোধিসত্ত্বগণের প্রথম মূলাপত্তি।

---

১ ধ্যানপদ্ধতিসার (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫৭)।

শূন্যতা সকলের বোধগম্য নহে। সেজন্য উহা সকলের নিকট প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। অনধিকারীর নিকট উহা প্রকাশ করিলে, তাহাদের উপকার না হইয়া মহা অপকার হয়।

যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, যাহা স্পর্শ করিতেছি, তাহা শূন্য, তাহার অস্তিত্ব নাই; আমি, তুমি, সে, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পরিবার, দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, সেবা, সমস্তই অস্তিত্বহীন, মিথ্যা—ইহা শ্রবণ করিলে প্রাকৃতজনের মহাত্রাস উপস্থিত হয়। তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। তাহাতে তাহার উন্নতি না হইয়া অবনতিই হয়। যখন সৎ, অসৎ, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ নরক—কিছু নাই, তখন সৎপথে চলিবার জন্য এত কষ্ট কেন। ইন্দ্রিয়সংযমাদির জন্য কেন এ অনর্থক প্রযত্ন। ব্যভিচার হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রয়োজন কী। এইভাবে আপাতরমণীয় পাপপথে প্রবৃত্ত হওয়াই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্যই তাহার প্রতি শূন্যতার উপদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শাস্ত্রে আছে—সৎ, অসৎ, পাপপুণ্য আদি সমস্তই মিথ্যা বা মোহ হইলেও, মোহ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, মোহকেই অবলম্বন করিতে হইবে (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। এইজন্য দান, শীল, ক্ষমা বীর্য ধ্যানাদি পঞ্চপারমিতা অবলম্বন করিয়া পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই পঞ্চপারমিতাতে সাধক যখন সিদ্ধ হইবেন, তখনই পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান বা প্রজ্ঞাপারমিতা বা শূন্যতার উপদেশ তাহাকে দিবে—তাহার পূর্বে নহে।

বোধিসত্ত্বগণের এইরূপ আটটি মূলাপত্তির এবং অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের (অর্থাৎ রাজার) (স্তূপের ধনহরণ, ভিক্ষু-হত্যাদি) পাঁচটি মূলাপত্তির উল্লেখ উক্ত "আকাশগর্ভসূত্রে" পাওয়া যায়।

৫।১০৫-১০৬। শিক্ষাসমুচ্চয়—শান্তিদেবের অন্যতম গ্রন্থ ('মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য)।

সূত্রসমুচ্চয়—শান্তিদেবের অন্যতম গ্রন্থ, অধুনা বিলুপ্ত।

নাগার্জুনের "সূত্রসমুচ্চয়" সংস্কৃতে নাই। ইহার চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ আছে। ইহা ১০০৪-৫৮ খ্রীঃ ফাও (ধর্মরক্ষ ?) কর্তৃক চীন ভাষায় অনূদিত হয়। ভাষ্যকার প্রজ্ঞাকরমতি নাগার্জুনের "শিক্ষাসমুচ্চয়" ও "সূত্রসমুচ্চয়" এই দুই গ্রন্থ দেখিতে বলিয়াছেন। কিন্তু নাগার্জুনের শিক্ষাসমুচ্চয়ের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

৬।২৭-২৮। এখানে সাংখ্য-মত খণ্ডন করা হইতেছে।

৬।২৯। এখানে ন্যায়-মত খণ্ডন করা হইতেছে।

৬।১১৩। দশবল। (১) স্থানাস্থানজ্ঞানবল—শুদ্ধ ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ কী ঠিক কী ভুল সেই সম্বন্ধীয় জ্ঞান[১] (-বল)। (২) কর্মবিপাকজ্ঞানবল— কর্মফলসম্বন্ধীয় জ্ঞান (-বল)। (৩) নানাধাতুজ্ঞানবল—বিভিন্ন ধাতু (element) সম্বন্ধীয় জ্ঞান (-বল)। (৪) নানাধিমুক্তিজ্ঞানবল— বিভিন্ন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান (-বল) (৫) ইন্দ্রিয়পরাপরজ্ঞানবল—প্রাণিগণের শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট মনোবল সম্বন্ধীয় জ্ঞান (-বল)। ৬। সর্বত্রগামিপ্রতিপথজ্ঞানবল—সর্বত্র-গামী মার্গ সম্বন্ধীয় জ্ঞান (-বল)। সর্বধ্যানবিমোক্ষসমাধিসমাপত্তিসংক্লেশ-

[১] ইহার ব্যাখ্যা নানাজনে নানাপ্রকার করিয়াছেন।

ব্যবদানব্যুত্থানজ্ঞানবল—সর্বপ্রকার ধ্যান, চিত্তবৃত্তিনিরোধের সর্বপ্রকার স্তর – সমাধির উচ্চ উচ্চতর অবস্থার[1] অশুদ্ধি, বিশুদ্ধি ও উৎপত্তি (অথবা সমাধি হইতে উত্থান) সম্বন্ধীয় জ্ঞান (-বল)। (৮) পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞানবল— পূর্বজন্মবিষয়ক জ্ঞান বা জাতিস্মরত্ব। (৯) চ্যুত্যুৎপত্তিজ্ঞানবল— জন্মমৃত্যু সম্বন্ধীয় জ্ঞান (-বল)। (১০) আস্রবক্ষয়জ্ঞানবল—তৃষ্ণা, পুনর্জন্ম, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা ধ্বংসকারী জ্ঞান (-বল)।

অন্যত্র, বুদ্ধের অন্যপ্রকারের দশবলের কথা আছে। বাহুল্যভয়ে উহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

মহামৈত্রী—পুত্রস্নেহানুরূপ স্নেহ হইল মৈত্রী। শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ, ১৯।

মহাকরুণা—আর্তপুত্রের প্রতি পিতার স্নেহানুরূপ স্নেহই করুণা। বোধিচর্যাবতার, ৯।

"মাতা যে-ভাবে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, সমস্ত জীবগণের প্রতি চিত্তকে সেইরূপ অপরিমেয় ভাবে ভাবান্বিত করিবে"। সুত্তনিপাত, ১।৮।৭।

"গুণবান্ একমাত্র পুত্রের প্রতি যেমন গৃহস্থব্যক্তির মজ্জাগত প্রেম, মহাকরুণালব্ধ বোধিসত্ত্বেরও সমস্ত জীবজগতের প্রতি সেইরূপ মজ্জাগত প্রেম"। শিক্ষা, পৃ, ২৮৭; মৈত্রীসাধনা, পৃ, ১৬।

"বোধিসত্ত্বগণের এই মহামৈত্রী কী।

"যাঁহার মধ্যে এই মহামৈত্রী উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের সমস্ত কল্যাণের উৎস পর্যন্ত সমস্ত জীবগণকে দান করেন। অথচ তাঁহার কোনো প্রতিদানাকাঙ্ক্ষা করেন না।

"বোধিসত্ত্বগণের এই মহাকরুণা কী।

"তাঁহারা সর্বপ্রথম অন্য সমস্ত প্রাণীর বোধি আকাঙ্ক্ষা করেন—নিজের নহে।" শিক্ষা, পরি, ৭, পৃ, ১৪৬; মৈত্রীসাধনা, পৃ, ১৭।

৬।১১৪। যদি কেহ বলেন—বুদ্ধের চিত্তে হিতাকাঙ্ক্ষা বা সদ অভিপ্রায় রহিয়াছে—আর অন্য প্রাণিগণের চিত্তে অহিতাকাঙ্ক্ষা বা অসদভিপ্রায় রহিয়াছে, ইহাদের উভয়ের কেমন করিয়া সমান সম্মান হয়।

ইহার উত্তর এই যে—কেবলমাত্র অভিপ্রায়ের (তাহা সৎই হউক আর অসৎই হউক) কোনো গুরুত্ব নাই। ফল দেখিয়াই তাহার গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য। জীবগণের

---

[1] বৌদ্ধশাস্ত্রে ধ্যানসমাধির নয় প্রকার স্তর বা উচ্চ উচ্চতর অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম চারিটিকে—প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান বলা হয়। এই চারিটি ধ্যান বুদ্ধমূর্তি আদি রূপকে অবলম্বন করিয়া। ইহাতে রূপের উপলব্ধি হয়। ইহার পরের চারিটি অবস্থা রূপাতীত। উহাতে রূপের উপলব্ধি হয় না।

নবমটি হইতেছে সমাধির সর্বশেষ অবস্থা যখন সর্বপ্রকার চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়। সমাধির এই অবস্থায় মৃতদেহের সহিত সমাধিস্থ ব্যক্তির দেহের প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, দেহ তাঁহার উষ্ণ থাকে, প্রাণ নির্গত হয় না এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নষ্ট হয় না।

বিমোক্ষ— সাংসারিক বিষয় হইতে মুক্ত হওয়া। ইহাও ঐ ধ্যানসমাধির সাহায্যে হয়।

সমাপত্তি— ধ্যানসমাধির স্তর বা সিদ্ধি। কাহারো মতে প্রথম আটটি। কাহারো মতে ঐ নয়টিই।

অভিপ্রায় মন্দ হইলেও তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে-ফল লাভ হইল, তাহা বুদ্ধকে অবলম্বন করিয়া যে-ফল লাভ হয় তাহা হইতে কম নহে। সুতরাং এইদিক হইতে বুদ্ধ ও অন্ত প্রাণিগণ সমান, তাই তাঁহাদের উভয়েরই সমান সম্মান।

৭।১৯। মহাযানের বোধিসত্ত্ব সর্বজীবের হিতসুখকারী বোধিচিত্তের শক্তিতে শ্রাবকযানের (বা হীনযানের) শ্রাবক বা সাধকগণের অপেক্ষা দ্রুতবেগে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

৭।৩২। ইহা পূর্বশ্লোকের পুনরাবৃত্তিমাত্র। সেজন্ত অনেকে ইহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। স্থাম ও মান এখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চিত্তের উন্নতি, অর্থাৎ চিত্তের দুর্বলতা গিয়া, দৃঢ়তা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে 'স্থাম' বা 'মান' 'বলা হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ৪৬-৬১ শ্লোক।

৭।৪৪। ইহা সুখাবতীতে, অমিতাভ বুদ্ধের স্বর্গে, বোধিসত্ত্বগণের জন্মবিবরণ।

৭।৬২-৬৫। রতিবল বা সৎকর্মাসক্তির দৃষ্টান্ত।

৭।৬৬। মুক্তি বলের দৃষ্টান্ত

৭।৬৭-৭৩। নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত

৭।৭৪। অপ্রমাদের বিষয় ধর্মপদ, ২। দ্রষ্টব্য।

৭।৭৪-৭৫। বশিতার (বা আত্মবশবর্তিতার) দৃষ্টান্ত। শুভকর্মে উৎসাহকে বীর্য বলা হয়। আলস্য কুৎসিত বিষয়ে আসক্তি, দুষ্কর বিষয় হইতে নিবৃত্তি বা অনধ্যাবসায় এবং (তাহার জন্ত) নিজের প্রতি অবজ্ঞা, বীর্যের বিপক্ষ। বীর্যের এই বিপক্ষের বশীভূত না হইয়া বীর্যের বশীভূত হইলেই বশিতা লাভ হয়।

৮।১০২। "দুঃখই রহিয়াছে, দুঃখী কেহ নাই, ক্রিয়া রহিয়াছে, কারক নাই। নির্বাণ আছে, নির্বৃত পুরুষ নাই। পথ রহিয়াছে, পথিক নাই।" বিসুদ্ধিমগ্‌গ, ইন্দ্রিয়সচ্চনিদ্দেস।

৮।১০৩। প্রশ্ন হইবে— যখন দুঃখী নাই, তখন "উহার দুঃখ দূর করো" "তাহার দুঃখ দূর করো"—এইভাবে পরের দুঃখ দূর করিবার কথা বলিতেছ কেন। দুঃখী যখন নাই তখন ভালোই হইল—পরের দুঃখ দূর করিবার প্রসঙ্গই নির্মূল হইল।

ইহার উত্তর এই যে—দুঃখী নাই বলিয়া পরের দুঃখ-নিবারণে নিবৃত্ত হইতেছ, ভালো কথা—তবে নিজের দুঃখ-নিবারণেও নিবৃত্ত হও। কেননা, (তথাকথিত) তোমার মধ্যেও তো দুঃখী বলিয়া কেহ নাই।

(তথাকথিত) তোমার মধ্যে দুঃখী না থাকা সত্ত্বেও যেমন (তথাকথিত) তোমার দুঃখ-নিবারণে তুমি উৎসুক, সেইরূপ (তথাকথিত) অন্তের দুঃখ-নিবারণেও কেন তুমি উৎসুক হও না।

দুঃখ যখন দূর করা উচিত—তখন সকলের দুঃখই দূর করা উচিত।

৮।১০৬। সুপুষ্পচন্দ্রের ইতিহাস সমাধিরাজসূত্রে (Gilgit Mss. Vol. II, Calcutta, 1941) পাওয়া যায়। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় ইহার কাহিনী দিয়াছেন, প্রজ্ঞাকরমতির ভাষ্যেও ইহার কাহিনী আছে।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

নৈরাত্ম্য-পরিপৃচ্ছা

আচার্য অশ্বঘোষকৃত। সংস্কৃত, তিব্বতী-অনুবাদ ও ইংরেজি ভূমিকাসহ সম্পাদিত। বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

মূল সংস্কৃতগ্রন্থ পাওয়া যাইত না। সুতরাং উহা লুপ্ত হইয়াছে, এই ধারণায় গ্রন্থকার উহার তিব্বতী-অনুবাদ হইতে সংস্কৃত করেন। পরে ঐ গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হয়। দেখা যায়, গ্রন্থকারের অনুবাদ মূল সংস্কৃতের সঙ্গে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। মূলগ্রন্থ লুপ্ত হইলেও তিব্বতী-অনুবাদের সাহায্যে পুনরায় তাহার উদ্ধার সম্ভব—বিশেষ করিয়া ইহা দেখাইবার জন্যই, মূলসংস্কৃত, গ্রন্থকারের সংস্কৃত ও তিব্বতী-অনুবাদসহ এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

অধ্যাপক লুই দ লা ভালে পুশেঁ (Louis de la Vallée Poussin) বলেন :—

"Indeed I admire how in the major part of the text, verse and prose, the restoration approaches the original !"

পরলোকগত অধ্যাপক Sylvain Lévi বলিয়াছেন :—

"Even without knowing Tibetan, by comparing the two Sanskrit texts, one can see that by an exercise of this kind, a degree of exactness may be attained. The experiment is conclusive. * * *

"Thus, India which because of her indifference, has allowed so many monuments of her past to perish, can reinstate in her tradition a number of works which did honour to her genius, in ancient times."

ইহা পাঠ করিলে মহাযানিক অনাত্মবাদ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ হইবে।

ত্রিস্বভাব-নির্দেশঃ

আচার্য বসুবন্ধুকৃত। মূলসংস্কৃত তিব্বতী-অনুবাদ, ইংরেজি-অনুবাদ, সংস্কৃত-তিব্বতী, তিব্বতী সংস্কৃত শব্দসূচী, ইংরেজি ভূমিকা এবং অন্যান্য যোগাচার-দর্শনশাস্ত্র ও আচার্য গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকা হইতে বহু অনুরূপ পাঠ সহ সম্পাদিত। বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

ইহা অধ্যয়ন করিলে যোগাচার বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ হইবে। ইহার সহিত শাংকর বেদান্তের কিরূপ সাদৃশ্য তাহাও জানা যাইবে।

কাশী কুইন্‌স্ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্ চান্সলার পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় ডক্টর স্যার গঙ্গানাথ ঝাঁ (এম, এ, ডি, লিট, সরস্বতী ইত্যাদি) লিখিয়াছিলেন : * * * "Allow me to congratulate you on the excellent execution of your work. It leaves nothing to be desired. * * * The more we read old works like this, the more becomes our wonder why the succeeding scholars should have quarrelled among themselves.

This work of Vasubandhu could very well be regarded as a text book on Vedanta. The older people knew this of old and hence called the মায়াবাদ্ "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ"।

স্বনামধন্য পণ্ডিত সুখলালজী লিখিয়াছেন :

"ইহা নিঃসন্দেহ যে বসুবন্ধুর এই গ্রন্থ ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বৌদ্ধ ও ঔপনিষদ দর্শনের পরস্পরের সাদৃশ্য বিষয়ে এবং তাহাদের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা যথেষ্ট আলোক-সম্পাত করিবে।

ইহার সম্পাদনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। পরিশিষ্টভাগে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা বিশিষ্ট বিদ্বানগণের চিত্ত আকৃষ্ট করিবে। এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা বিশ্বভারতীর মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে (হিন্দিপত্রের বাংলা অনুবাদ)।

মৈত্রীসাধনা

বেদ, উপনিষদ, পাতঞ্জল দর্শন, মহাভারত, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠাদি বেদপন্থী ও সুত্তনিপাত, বিসুদ্ধিমগ্‌গ, মহাযানসূত্রালংকার, শিক্ষাসমুচ্চয়, বোধিচর্যাবতারাদি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে পাঠ সংগ্রহ করিয়া ভারতের মৈত্রীর আদর্শ কিরূপ ছিল এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ কিভাবে মৈত্রীসাধনা করিয়া গিয়াছেন, কতিপয় মৈত্রী-সাধক-সাধিকার জীবনকাহিনী সহ তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল সংস্কৃত ও পালি পাঠ এবং তাহার প্রাঞ্জল, সরস বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ ইহা বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচিত হয় এবং তিনি ইহার আগাগোড়া সমস্ত দেখিয়া দেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

'পরিচয়' বলেন : "মৈত্রীর আদর্শ প্রাচীন ভারতের সাধনায় কিভাবে মূর্ত হইয়াছিল, লেখক সংস্কৃত সাহিত্য হইতে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমাদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে লেখক শূন্যবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মৈত্রীসাধনার যে-সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়াছেন, সেইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও উল্লেখযোগ্য বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধনার পরস্পর বিরোধ সত্ত্বেও কিভাবে উভয় মতবাদই বিশ্বমৈত্রীর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে—তাহার পরিচয়। নানা তন্ত্রে, ধর্মসাধনার নানা বিকৃতিতে আমাদের জীবন পীড়িত। বহুবিভক্ত ভারতবর্ষে একদা মৈত্রীসাধনা কিরূপ উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল, তাহার স্মরণও আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। * * *

"যাঁহারা বিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী, তাঁহারা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনসময়ে এই পুস্তকটির কথা আশা করি, স্মরণ রাখিবেন। সাম্প্রদায়িকতায় দীক্ষার সম্ভাবনা ধর্মশিক্ষাদানের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি। কিন্তু মৈত্রীসাধনা পুস্তকে ধর্মের যে-আদর্শ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শুধু সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত নহে, সর্বতোভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। বইখানির সাহিত্যিক মূল্যও যথেষ্ট। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির লেখক যে-অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দ। তাই বইখানি শুধু নীতিশিক্ষা-উপযোগী নহে, ইহার রচনাও

উপভোগ্য। এই জাতীয় পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার বিশ্বভারতীর উপযুক্ত কাজ।" (বৈশাখ, ১৩৪৮)।

'যুগান্তর' বলেন—…"মানব সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভারতের দান যে কতখানি, তাহা এই বইটি পড়িলে সকলেই উপলব্ধি করিবেন। গ্রন্থকারের রচনাপ্রণালী যেমন ঋজু, তেমনি পরিচ্ছন্ন। শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করাতেও তাঁহার বিচক্ষণতা লক্ষ্যণীয়।"…(যুগান্তর, ৯।৩।৪১)

ওয়ার্ধার "সর্বোদয়" বলেন—"এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মূল্য আট আনা—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট ইহার মূল্য উহার অনন্ত গুণ।…পাঠকগণের জন্য এই গ্রন্থ হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়া 'সর্বোদয়ে' প্রকাশ করিতে থাকিব।…"(আগষ্ট, ১৯৪২)

Modern Review বলেন—"It is a very valuable production" (March, 1941).

সনাতন ধর্ম

হিন্দুধর্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় পুস্তিকা। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য চারি আনা মাত্র।

ইহা পাঠ করিলে, হিন্দুর প্রাচীন সমাজব্যবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা যাইবে। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ধর্মসূত্র, স্মৃতি, পুরাণাদি, ধর্মশাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ ও দৃষ্টান্তাদি সহ হিন্দুর সমাজব্যবস্থা যে সাম্য ও উদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা দেখানো হইয়াছে।

'প্রবাসী' আদি পত্রিকা কর্তৃক প্রশংসিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেন :—"তোমার রচিত "সনাতনধর্ম" পুস্তিকাখানি পাঠ করে আমি বিশেষ পরিতৃপ্তি বোধ করেছি। এই গ্রন্থে শাস্ত্রগবেষণা ও লোকহিতৈষণা মিশ্রিত হয়ে আমাদের সমাজের পক্ষে সেটা মূল্যবান হয়েছে। লোকপ্রচলিত সংস্কার, যুক্তিবিরুদ্ধ এমন কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হলেও তাকে উন্মূলিত করা অতি দুঃসাধ্য। কিন্তু ফললাভের প্রত্যাশা ত্যাগ করেও কর্তব্যপালনের উপদেশ আমাদের শাস্ত্রে আছে, তোমার সেই সাধনায় আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ। স্বাস্থ্যকে রক্ষা করার চেয়েও রোগকে দূর করা দুরূহ। দেশ আপন পুরাতন অকল্যাণগুলিকে তীব্র স্নেহের সঙ্গে আপন কলেবরে পোষণ করে, প্রতিদিন তার শাস্তিভোগ করেও তার প্রতিকারচেষ্টাকে ক্রোধের সঙ্গে নিরস্ত করার জন্য দণ্ডহাতে উদ্যত হয়, এইজন্যই তোমার অধ্যবসায়কে আমি ধন্য বলি।"